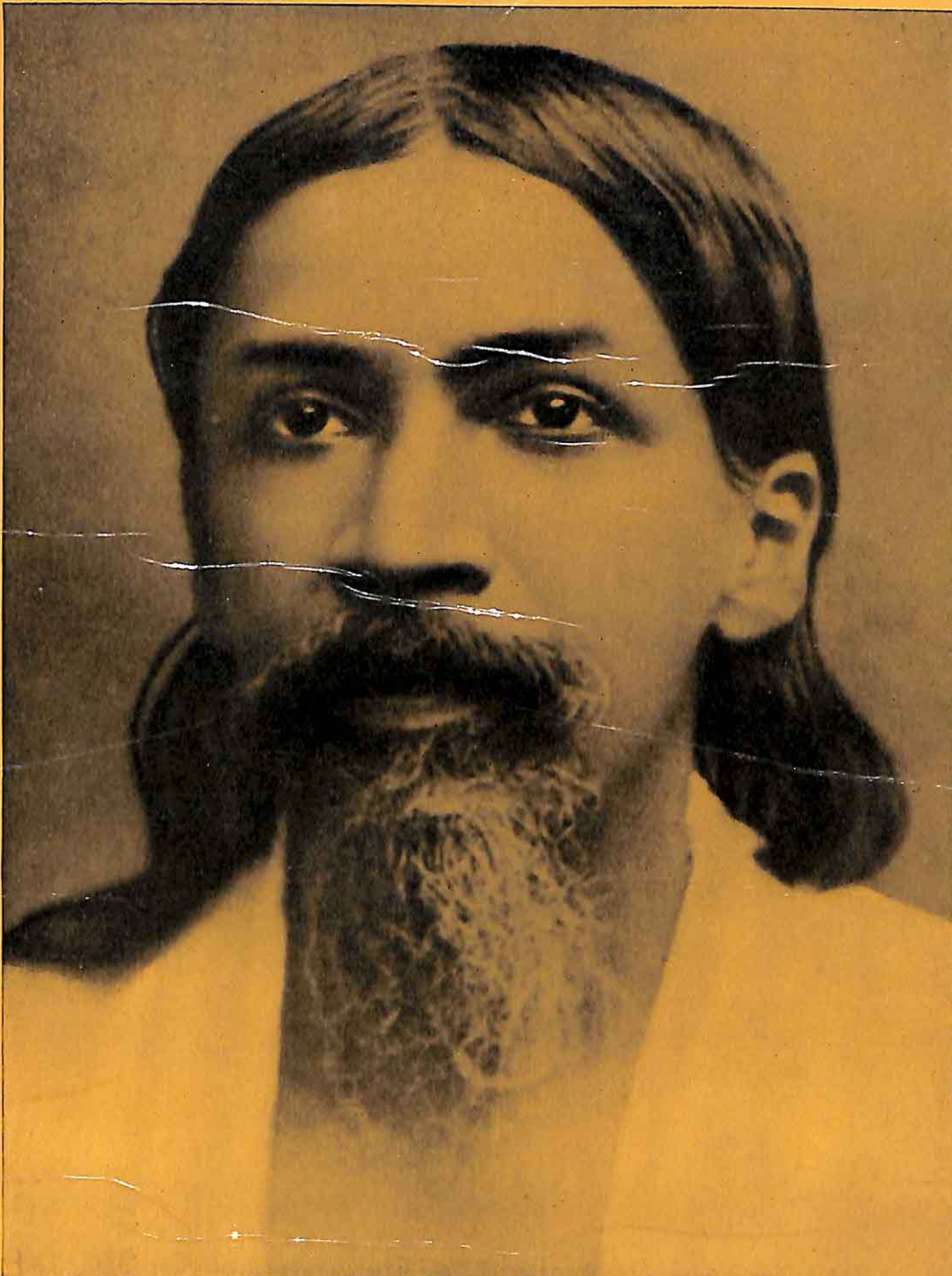


শ্রীঅরবিন্দায়ন • নীরদবরণ

শ্রীঅরবিন্দায়ন

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

নীরদবরণ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

SRI AUROBINDAYAN by Nirodbaran

প্রকাশক : সত্য বসু
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৩
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪
পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : ১৫ই আগস্ট ১৯৮৭

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯, গুলুওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীঅরবিন্দায়ন' এবার কিছুটা পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। তা ছাড়া, যে-সব ছোটখাট ভুল-ত্রুটি ছিল, সেগুলোও যথাসাধ্য সংশোধন করা হল। ইংরেজী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের একাধিক বিস্তৃত জীবনী আছে। বাংলায় সেরকম কিছু নেই। এই বইখানি সে অভাব কতকটা পূরণ করবে—যদিও এর আবেদন শিশুমনের কাছে, শিশুদের জন্য সংক্ষেপে সরলভাষায় বইখানি লেখা। লেখকের এই প্রচেষ্টা সর্বজনের অভিনন্দনীয়।

তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায়। আর পাঁচজনের মতো শ্রীঅরবিন্দেরও কি একটি সামগ্রিক জীবনচিত্র আঁকা চলে ? শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন, My life is not on the Surface. তাঁর জীবন সপ্রকাশ নয়। অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো তাঁর বহির্জীবনের যেটুকু অংশ আমাদের বোধগম্য, কেবল তারই বিবরণ দেওয়া চলে। তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস—যা তাঁর প্রকৃত পরিচয় বহন করে—অজ্ঞাত। তবে অন্তর্জীবনের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে বহির্জীবনের ঘটনাবলীতে। সেই ঘটনাগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করে রচিত জীবনকাহিনী আমাদের মানসক্ষেত্রে তাঁর একটি শ্রদ্ধার আসন রচনা করে।

[signature]

১৫ আগস্ট, ১৯৮৭

ভূমিকা

এই বইটি শ্রীঅরবিন্দের জীবনী নয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর জীবনী লিখতে নিষেধ করে রসচ্ছলে বলেছেন, "আমার শিষ্যদের হাতে ছাপার ঠাণ্ডা অক্ষরে আমি মরতে চাই না।" তিনি আরও বলেছেন যে তাঁর জীবনী একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন। বস্তুতঃ যোগীদের প্রকৃত জীবন হল অন্তর্জীবন ; তারই কতকগুলি ঢেউ বাহ্য ঘটনা হিসাবে প্রকাশ পায়। এই ঘটনাবলী নিয়ে লেখকদের কারবার। কাজেই আমরা তাঁদের স্বরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারি না।

তবুও, এই বাহ্য ঘটনাগুলির মূল্য আছে বৈকি! সাধারণ মানুষ তাতে একটা অবলম্বন, এমনকি দিশা পায়, যদি অবশ্য ঘটনাগুলি সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়। বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের জীবন এ-হিসাবেও পথিকৃৎ হতে পারে। তাঁর নিজের লেখা ও মুখের বাণী থেকে আমাদের সেসব ঘটনাগুলি জানবার সৌভাগ্য হয়েছে। সেগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ক'রে বইটি রচনা করা হয়েছে। আমার নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নিদর্শনও রয়েছে। সেজন্যে বইটির নাম দেওয়া হল শ্রীঅরবিন্দায়ন, শুধু জীবনী নয়।

বন্ধুদের অনুরোধে বইটি সহজ ভাষায় লেখা, যাতে বাঙালী সমাজ, বিশেষ করে বাঙলার অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা বইখানির মর্ম গ্রহণ করতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে শ্রীঅরবিন্দের বিরাট মাহাত্ম্য। বর্তমান সময়ে তার গুরুতর প্রয়োজন আছে।

নীরদবরণ

১৫ই জুলাই, ১৯৭৩
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী ৬০৫০০২

সূচী

সূচী

সূচনা

১৫ই আগস্ট

ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকালাম। তাতে প্রায়ই নানা সুন্দর উদ্ধৃতি ছাত্ররা লিখে রাখে। আজ কিন্তু লেখা আছে, "আজ অশোকের জন্মদিন।"

"একটা গল্প বলুন",—ছাত্রছাত্রীরা বলে উঠল।

ওদের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। মিষ্টি হাসি ও প্রত্যাশায় উজ্জ্বল মুখের ছবি! তাদের জন্মদিনে শিক্ষকের কাছে গল্প শোনার রেওয়াজ শিক্ষকেরা মেনে নিয়েছেন। বললাম, বেশ! এমন এক মহাপুরুষের গল্প বলব, যাঁর নাম তোমরা শুনেছ, কিন্তু যাঁর বিষয়ে অতি অল্পই জান। অথচ তাঁর মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে খুব কমই আসেন। তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সবাই শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, ঋষি যোগী,—যোগেশ্বর। তিনি যোগী বলে তাঁর কথা তোমরা জান না, জানতে বিশেষ আগ্রহও নেই। কিন্তু যোগের কথা বাদ দিলেও তিনিই প্রথম দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন।

১৫ই আগস্ট তাঁর জন্মদিন, আর আশ্চর্যের বিষয়, এই ১৫ই আগস্ট আবার স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এটা কি আকস্মিক? এই দুই অসাধারণ ঘটনা একই তারিখে ঘটল, এটা ভগবানের অভিপ্রেত; তাঁরই ইচ্ছায় ঘটেছে। পরে আমরা তার পরিচয় পাব। এখন বুঝতে পারছ কার কথা ভাবছি।

শ্রীঅরবিন্দ?

হাঁ, তবে মুশকিল হল তাঁর গল্প একদিনের ব্যাপার নয়।

তাতে কি? আমরা সপ্তায় সপ্তায় শুনে যাব।

প্রথম অধ্যায়

বাল্যকাল : ইংলণ্ড, ম্যানচেস্টার

তাঁর বাল্যকাল ও প্রথম যৌবন কেটেছে বিলাতের বনবাসে, প্রায় চৌদ্দ বছর ; বাকি যৌবন গুজরাটে, এটাও অর্ধেক বনবাস ; তিন-চার বছর মাত্র নিজের জন্মস্থান কলকাতায়, তাও এক বছর জেলে। অবশিষ্ট দীর্ঘ জীবন পণ্ডিচেরীতে।

এখন, চল আমরা কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যাই একশো বছর পেছনে। তিনটি বিদেশী বালক, সহোদর ভাই তারা, হঠাৎ ইংলণ্ডের ম্যানচেস্টার শহরে উপস্থিত। বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ।

অরবিন্দের বয়স মাত্র সাত বছর।

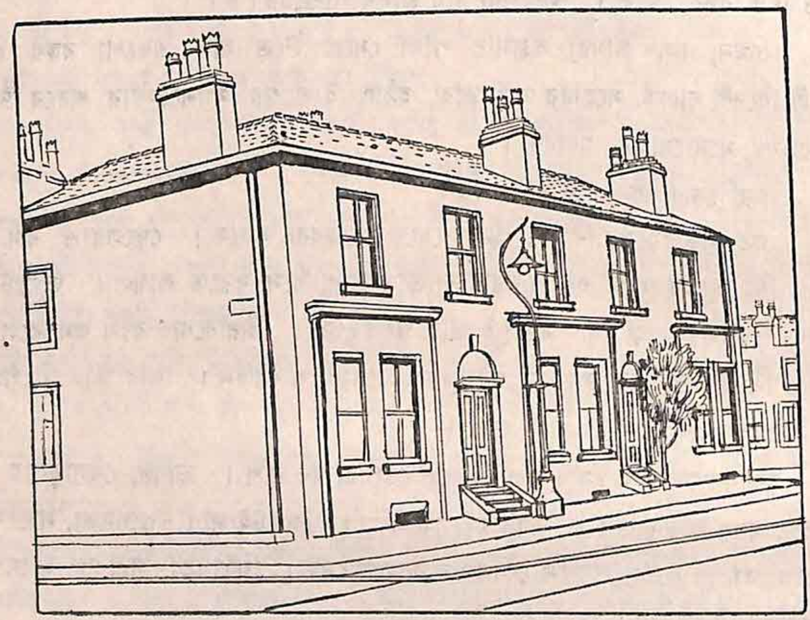
এত কচি বয়সের বিদেশী ছেলে দেখে সাহেবরা অবাক! ছেলেরাও কম অবাক নয়। মিঃ ড্রুয়েট নামে এক পাদরীর বাড়িতে তারা বাস করতে লাগল। ড্রুয়েট হলেন তাদের পিতৃবন্ধুর আত্মীয়। বড় দুই ভাই স্কুলে গেল। অরবিন্দের বয়স কম বলে তাকে সাহেব নিজের বাড়িতে পড়াতে লাগলেন ইংরেজী ও লাটিন। আর তাঁর স্ত্রী পড়াতেন অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও ফরাসী ভাষা।

অরবিন্দকে স্কুলে যেতে হল না বলে তোমরা খুব খুশি। ভাবছ, খেলাধুলায় কেমন চমৎকার সময় কাটত তাহলে, আর গল্প-বই পড়ে। মোটেই না। প্রথমতঃ, সাহেব জাত বড় কড়া, তাদের কর্তব্য পালনে কোনদিন আলস্য নেই। দ্বিতীয়তঃ, অরবিন্দ আমোদপ্রিয় স্কুলপালানো ছেলে নয়।

ড্রুয়েট অল্প পরিচয়েই বুঝে নিলেন অরবিন্দ আলাদা জাতের ছেলে ; অসাধারণ মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর একাগ্রতা। তেমনি তার মধুর স্বভাব : শান্ত, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী। লেখাপড়াতেই তার অনুরাগ। খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, হৈ-হল্লা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গালগল্প, কোন দিকে আকর্ষণ নেই। পড়াশোনা আর নিরিবিলি জীবন, এই হল বাল্য বয়সের অরবিন্দ। আশ্রমবাসী প্রমোদ চ্যাটার্জির আঁকা অরবিন্দের এই সময়ের ছবি দেখে আশ্রমজননী শ্রীমা বলেছিলেন, "ছবিতে তাঁর প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা এবং সরলতা বেশ ফুটে উঠেছে ; এই গুণগুলি নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর ভিতরের সত্তা দেখা যাচ্ছে একেবারে সামনে। সংসার সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।"

অরবিন্দের বড়দা বিনয়ভূষণের মত হল, "অরো ভারি নম্র ও শান্ত ছেলে ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাকে দারুণ একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসত।"

কাজেই এমন ছেলেকে ড্রুয়েট দম্পতি ভালবাসবেন, তা আর আশ্চর্য কি ? যত বড় হতে লাগলেন অরবিন্দ, নিজের পাঠ্যবিষয় ছাড়া বাইরের বই পড়তে লাগলেন প্রচুর, বিশেষ করে ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্য, সেকস্‌পীয়র, শেলী ও কীটস, আর বাইবেল।



ম্যানচেস্টারে মিঃ ড্রুয়েটের এই বাড়িতে তিন ভাই থাকতেন।

শেলীর কাব্য Revolt of Islam (ইসলামের বিদ্রোহ) তাঁকে মুগ্ধ করে। যদিও অনেক কিছু বুঝতে পারতেন না, তবুও পড়ে আনন্দ পেতেন। বোধ হয় শেলীর মতো কোন স্বপ্নলোকে চলে যেতেন। শেলী যেমন স্বপ্ন দেখতেন, এই পৃথিবী একদিন বদলাবে, আনন্দে, আলোয় আর সৌন্দর্যে পূর্ণ হবে, অরবিন্দও কি সেরকম ভাবুক ছিলেন ? তবে শেলীর কাব্য তাঁকে যে প্রেরণা দিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবিতা পড়তেন আর লিখতেন Fox Family Magazine বলে একটা কাগজে।

দেখতে দেখতে চারটি বছর কেটে গেল। অন্তর্জগতে চেতনা বাড়ল, কিন্তু বাইরের জগৎ বাইরে পড়ে রইল। এগারো বছর বয়সে তাঁর প্রবল অনুভূতি হল যে পৃথিবীতে

একটি নূতন বিপ্লব বা জাগরণ আসছে, তাতে তিনি একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করবেন। এত অল্প বয়সে এরকম অনুভূতি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। তাঁর পরবর্তী জীবনে এটা কিভাবে ফলেছে তা দেখতে পাবে। এই হল মোটামুটি অরবিন্দের প্রথম ছাত্র-জীবন।

এখন তাঁর বাইরের জীবনের পরিচয় শোন :

একটি মজার গল্প রটেছিল যে অরবিন্দ খৃষ্টান হয়েছিলেন। ব্যাপারটা এই রকম : ড্রুয়েটের সঙ্গে থাকতেন তাঁর মা। বুড়ী অরোকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া খৃষ্টান। স্নেহের বশে তিনি স্থির করলেন যে অরোকেও খৃষ্টান করতে হবে। এমন শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলের আত্মাকে কিছুতেই নরকে যেতে দেওয়া হবে না। সব গোঁড়া খৃষ্টানের বিশ্বাস যে খৃষ্টান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকের স্বর্গে যাবার অধিকার নেই। বলা বাহুল্য অরোর এদিকে কোন টানই ছিল না। কিন্তু বুড়ীর মনে শান্তি নেই।

একদিন বুড়ী কাম্বারল্যাণ্ডে পাদরীদের এক সভায় যাবেন, অরোকে নিলেন সঙ্গে, যেন বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। অরো দেখল একদল পাদরীর মেলা। বেচারী কিছুই বুঝতে পারল না। লম্বা প্রার্থনা শুরু হল। অরোর মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। তখন একজন পাদরী এসে তাকে দুচারটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। বাচ্চা অরো 'হাঁ', 'না' গোছের মামুলি উত্তর দিলে উপস্থিত সকলে "আঃ, তার আত্মার উদ্ধার হল!" বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, যেন জলে ডোবা কাউকে বাঁচিয়ে তুলেছে!

তারপর কী হল শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায় শোন :

"আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কখন বাড়ি ফিরে যাব এই আমার ভাবনা। এমন সময় একটি পাদরী এসে আমায় বলল, প্রার্থনা কর। আমার প্রার্থনা করার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু শিশুরা শোবার আগে যেভাবে মামুলি প্রার্থনা করে, আমিও তাই করলাম। তাতেই তারা খুশি। তখন আমার বয়স দশ বছর। ম্যানচেস্টারে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।"

এই হল অরবিন্দের খৃষ্টান হবার গল্প। তা বলে তোমরা মনে ক'রো না যে এতে ড্রুয়েট সাহেবের সম্মতি ছিল। তিনি তাঁর মায়ের মতো গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর মতে প্রত্যেক ধর্মই সত্য। তাই কারও ধর্মের উপর তিনি জোরজুলুম করতেন না।

তাছাড়া অরবিন্দের বাবার কঠোর নির্দেশ ছিল, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ছেলেদের কোন উপদেশ দেওয়া হবে না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে কোন্ ধর্ম

ভাল, কোন্‌টি মন্দ। আর একটি কঠোর নির্দেশ দেন তিনি, তাঁর ছেলেরা যেন কোন ভারতীয়ের সঙ্গে না মেশে, অথবা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন খবর না রাখে।

কোন ভারতীয়ের মুখে এ ধরনের অদ্ভুত উক্তি তোমাদের অবাক করবে নিশ্চয়। ভাববে, তিনি দেশকে ভালবাসতেন না। কিন্তু সেটা ভুল। বিষয়টা পরিষ্কার করে বুঝতে হলে আমাদের গল্পের গোড়ায় ফিরে যেতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষ্ণধন ঘোষ

কে. ডি. ঘোষ ওরফে কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন বিলেতফেরত ডাক্তার। এখন তোমরা কথায় কথায় উড়ছ লণ্ডনে, পারিসে, নিউইয়র্কে। ইটালিতে লাঞ্চ খাও, লণ্ডনে ডিনার। কিন্তু প্রায় একশ বছর আগে? তখন হিন্দুরা 'কালাপানি' পার হলে তাদের জাতিচ্যুত করা হত, গ্রাম্য কথায় তাদের জাত যেত। এখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কোন বাছবিচার নেই। কিন্তু তখন হিন্দুর জাত যাওয়া সমাজে মস্ত কলঙ্কের বিষয়। তোমাকে 'একঘরে' করবে, তোমার বাড়িতে কেউ আসবে না, তোমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ নয়। তোমার বাড়ির ছেলেমেয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা মেলামেশা করতে পারবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি—কী সাংঘাতিক অবস্থা! শুধু কি তাই? এই সমস্ত ভয় ও দুর্দশা উপেক্ষা করে যাঁরা বিলেতে যেতেন, তাঁদের ফিরে এসে 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে হত অর্থাৎ গোবর খাওয়া, মাথা মুড়োনো, ব্রাহ্মণ ভোজন করানো ইত্যাদি পুণ্য কাজ করলে তবে তুমি জাতে উঠবে।

এহেন দুর্দশা ও লাঞ্ছনার ভয় মাথায় নিয়েও কৃষ্ণধন 'কালাপানি' পার হলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে। বাংলাদেশ থেকে প্রথম যাঁরা বিদেশে পড়তে যান, কৃষ্ণধন বোধহয় তাঁদের একজন। তাহলে বোঝ তিনি কেমন তেজী ছেলে ছিলেন। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয় স্বনামধন্য ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বড় মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গে। অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন স্বর্ণলতা। রংপুরে চাকরি করবার সময় কৃষ্ণধনের সরকারী বন্ধুবান্ধব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। স্বর্ণলতার রূপের প্রশংসায় তাঁরা এতই সোচ্চার ছিলেন যে তাঁর নাম দিয়েছিলেন Rose of Rangpur—রংপুরের গোলাপ। যেমন রূপে তেমনি গুণে, শিক্ষিতা, সুভাষিতা।

এবারডিন থেকে এম. ডি. ডিগ্রি নিয়ে কৃষ্ণধন দেশে ফিরে এলেন সাহেব হয়ে। খাওয়াদাওয়ায়, চালচলনে, পোশাকে পুরোদস্তুর সাহেব। তিনি কোন রকমের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হলেন না; তাঁর মতে ওসব কুসংস্কার, হাস্যকর ও অপমানজনক। তিনি বড়

চাকুরে, সিভিল সার্জন। সমাজের ভয় তিনি গ্রাহ্য করবেন কেন?

তোমাদের জানতে কৌতূহল হবে এই সাহেবপ্রীতির কারণ কি। মনে রাখবে, সাহেবরা অর্থাৎ ইংরেজরা তখন আমাদের শাসক—আমাদের রাজা। শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে, কর্মে সাহেবরা শ্রেষ্ঠ জাত। ভারতবর্ষকে বড় হতে হলে সাহেবদের নকল করতে হবে—এই ছিল আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোভাব। কৃষ্ণধন দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, বিশেষ করে গরিবদুঃখীদের জন্যে তাঁর দুয়ার সব সময় খোলা থাকত। টাকাপয়সা দিয়ে, ওষুধ দিয়ে কতভাবে যে সাহায্য করতেন তার হিসেব নেই। এক কথায়, তিনি ছিলেন গরিবদুঃখীর মা বাপ। এমন উদারচেতা ছিলেন যে বিলাতে নিজের ছেলেদের খরচ পাঠাবার টাকা থাকত না। রংপুরে কি খুলনায়, যখন তিনি সিভিল সার্জন ছিলেন, দেশবাসীরা তাঁকে দেবতার মতো পূজা করত। রংপুরে একটি খাল কাটা হল—তার নাম রাখল কে. ডি. ক্যানাল (K. D. Canal)।

রংপুরের সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। সাহেব তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করতেন না। তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু এই সাহেব যখন বদলি হলেন এবং তাঁর জায়গায় এলেন নতুন সাহেব, তিনি তখন একজন নেটিভ বাঙালীর এতখানি সম্মান সহ্য করলেন না। সাহেবকে ডিঙিয়ে দেশী লোককে কেউ মানবে, তা কখনো হয়? কাজেই তিনি সরকারের কাছে নানা সত্যিমিথ্যা নালিশ করে কৃষ্ণধনকে খুলনায় বদলি করালেন। সরকারের অবিচারে কৃষ্ণধন মর্মাহত হলেন। সাহেবপ্রীতিতে তাঁর প্রথম ফাটল ধরল এবং এই ফাটল ক্রমশ বাড়তে লাগল।

কৃষ্ণধনের যশোগাথা আপাতত এখানেই শেষ করি।

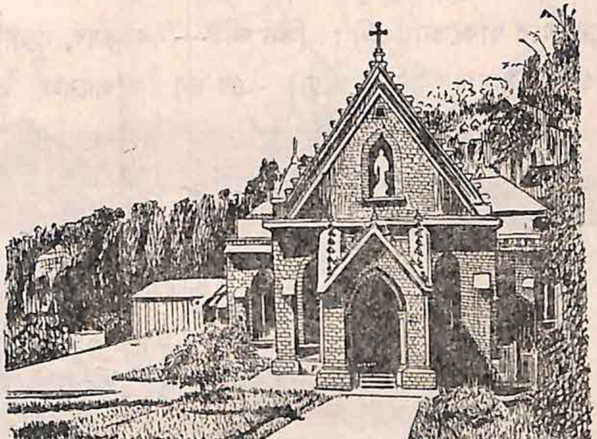
শিশু অরবিন্দ

কৃষ্ণধন খুলনায় থাকবার সময় শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে তাঁর জন্ম। মনোমোহন যেমন কৃষ্ণধনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তেমনি তাঁর স্ত্রীর বন্ধু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মা। আর দুজনেরই নাম স্বর্ণলতা। অরবিন্দ নামটাও তখন একেবারে নূতন—কৃষ্ণধনের আবিষ্কার। অরবিন্দ অর্থ পদ্ম; আধ্যাত্মিক অর্থে ভাগবত চেতনা। নামের সঙ্গে অরবিন্দের প্রকৃতির অপূর্ব মিল। শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুকুমার, কিন্তু দৃঢ়চেতা। তাঁর ছেলেবেলার ছবিতে লক্ষ্য করবে, কী শান্ত

মুখশ্রী আর দৃঢ়সংকল্প। এক যোগীর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে অরবিন্দের সৌরভে একদিন সমস্ত জগৎ আমোদিত হবে। অক্ষরে অক্ষরে তা সফল হয়েছে।

শিশু অরবিন্দ বাবার সাহেবি আবহাওয়ায় বড় হতে লাগল। কোন বাঙালীত্ব সাহেব সহ্য করতেন না। বাড়িতে কথা বলতে হত হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী ভাষায়। মাকে বোধ হয় মামি, বাবাকে ড্যাডি ডাকা হত! খাওয়াপরাও সাহেবি ধরনে চলত। শুধু কৃষ্ণধন নয়, তখনকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে এইসব ফ্যাশন চালু ছিল। সাহেবি শিক্ষার একটা কুফল হল, কৃষ্ণধন ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "আমার বাবা ছিলেন মস্ত নাস্তিক।"

অরবিন্দের যখন পাঁচ বছর বয়স, বাবা তিন ভাইকে চালান দিলেন দার্জিলিংএ Loreto (লরেটো) স্কুলে। মিশনারী স্কুল, সবাই সাহেবের ছেলেপিলে। কৃষ্ণধনের একান্ত বাসনা, সাহেবদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁর ছেলেরা সাহেব হয়ে উঠবে। দু'বছর



লরেটো স্কুল, দার্জিলিং

অরবিন্দ সেখানে ছিলেন। কতখানি সাহেব হয়েছিলেন আমাদের জানা নেই। পড়াশোনায় আচারে ব্যবহারে ভাল, ভদ্র ছিলেন সন্দেহ নেই। আর দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার বরফে ঘেরা পাহাড়, ফুল, ফার্ন ইত্যাদি দৃশ্যের মধ্যে বেড়াতে ভালবাসতেন নিশ্চয়।

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ সে সময়ের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন রাত্রে। দেখলেন, এক বিরাট অন্ধকার দারুণ বেগে তাঁর ভেতর ঢুকে পড়ছে আর সমস্ত বিশ্বকে ছেয়ে ফেলছে। তারপর থেকে যত বছর তিনি বিলাতে ছিলেন, সর্বক্ষণ একটা প্রকাণ্ড তামস তাঁকে ঘিরে থাকত। বিলেত থেকে ফিরে যেদিন ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করলেন, সেই দিনই এই আঁধার তাঁকে ত্যাগ করল।

অদ্ভুত, না ? এর অর্থ কি ? বলতে পারব না।

এবার দুচারটা মজার গল্প শোন :

একদিন স্কুলের ডরমিটরিতে ছেলেরা শুয়ে আছে। মেজদা মনোমোহনের খাটটা দরজার কাছে। একটি ছেলে রাত করে ফিরল ; বন্ধ দরজায় টোকা দিল বারবার, কোন সাড়া নেই। অবশেষে মনোমোহন বিরক্ত হয়ে বলল, "খুলতে পারব না। আমি ঘুমুচ্ছি।"

আর একটা ঘটনা বলি, ঋষি রাজনারায়ণ সম্বন্ধে। রাজনারায়ণ পণ্ডিত, স্বদেশ-প্রেমিক, বিপ্লবী আর ঋষিতুল্য পুরুষ। তাঁর মহৎ চরিত্রের অনেক কিছুই পেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। দেওঘরে থাকতেন তিনি। তিন ভাই—বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ ছুটির সময় দেওঘরে মামার বাড়ি গেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা দাদামশাইর সঙ্গে

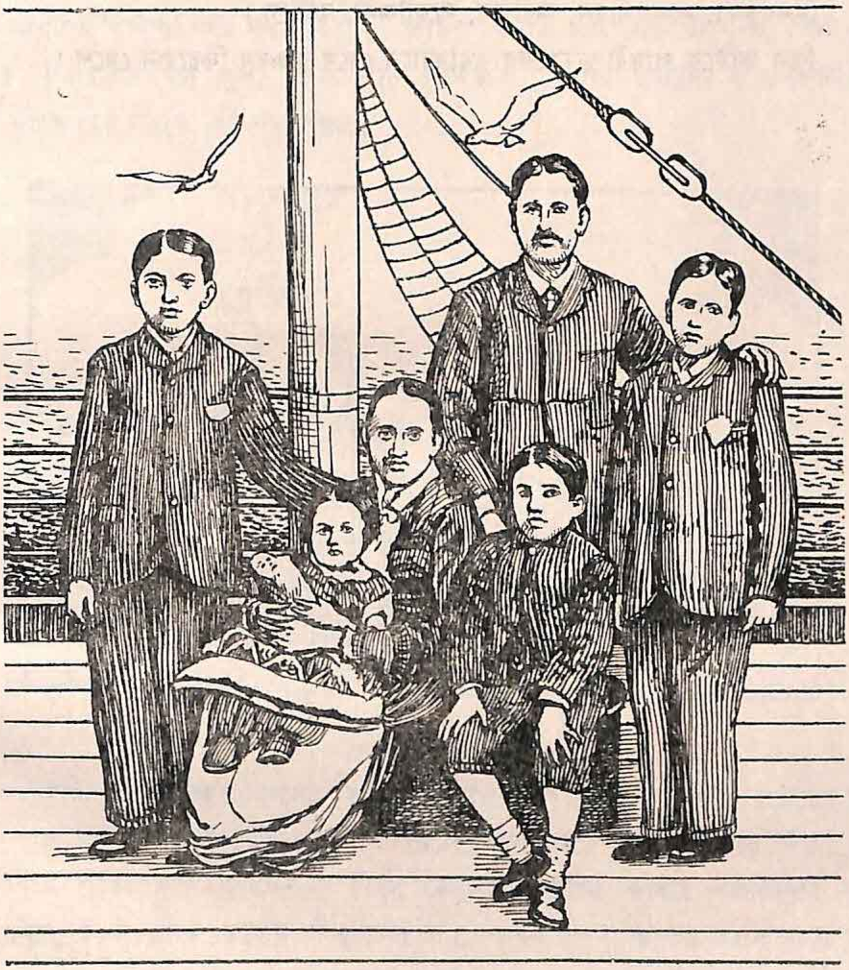


দাদু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছেন

বেড়াতে বের হয়েছে। তিন ভাই এগিয়ে চলেছে গল্প করতে করতে। হঠাৎ খেয়াল হল, কই, দাদু কই ? বেশ অন্ধকার, পথ-ঘাট জনশূন্য। চিৎকার করে ডাকতে লাগল।—কোন সাড়া নেই! তারা অগত্যা পিছন ফিরল তাঁকে খুঁজতে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল, দাদু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছেন।

আর একটি ঘটনা :

তাঁর মা স্বর্ণলতার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। একদিন তিনি মনোমোহনকে ধরে ভয়ানক মারতে লাগলেন। তা দেখে অরবিন্দের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।



কৃষ্ণধন স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ রওনা হলেন বিলেতে

'জলতেষ্টা পেয়েছে' বলে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সেই শিশুকাল থেকে কোন রকমের নিষ্ঠুরতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

এই হল অরবিন্দের শিশুকাল। পিতার সাধের অরো, যার সম্বন্ধে তিনি বরাবর পোষণ করে এসেছেন মহৎ আশা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎকে রূপ দেবার জন্য তিনি স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ রওনা হলেন বিলেতে। অরোর বয়স তখন সাত বছর। সমুদ্র পারে ক্রয়ডন শহরে ছোট ছেলেটির জন্ম হল—তার নাম বারীন্দ্র। তারা চার ভাই, এক বোন :

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন, অরবিন্দ, সরোজিনী, বারীন্দ্র।

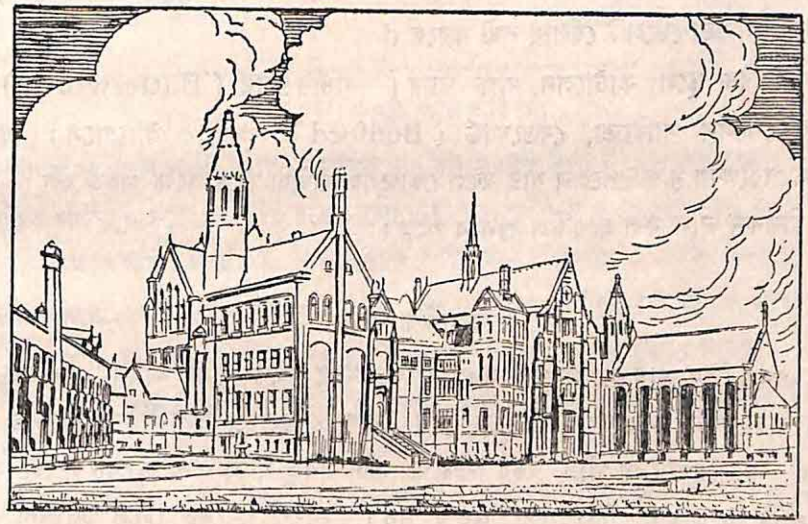
তিন ভাইকে পাদরী ড্রুয়েটের তত্ত্বাবধানে রেখে কৃষ্ণধন ফিরলেন দেশে।

তৃতীয় অধ্যায়

ছাত্রজীবন

লণ্ডন : সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল

তিন ভাই পাঁচ বছর কাটাল পাদরীর বাড়িতে। পাদরী চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়, ছেলেরা লণ্ডনে। পাদরীর মা গেলেন তাদের সঙ্গে অভিভাবিকা হিসেবে, সেই বুড়ী মা যিনি অরোকে 'খৃষ্টান' করে খুব গর্বিতা। ভাইরা ভরতি হল সেণ্ট পল্‌স্-এ, রইল বুড়ীর সঙ্গে। বিলাতের সেরা স্কুল, প্রায় পাঁচ শ' ছেলে। সেই ছাত্রদের মধ্যে হেডমাস্টার ডক্টর ওয়াকারের নজরে পড়ল অরবিন্দ।



সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল, লণ্ডন

জহুরি যেমন জহর চেনে, তিনিও তেমনি এক পলকে মেধাবী ছেলেদের চিনে নিতে পারতেন। তাদের বেছে নিয়ে নিজে পড়াতেন; কোন বিষয়ে কাঁচা হলে সে বিষয়ে পাকা করে তুলতেন। তিনি দেখলেন, লাটিন ভাষায় অরবিন্দের জ্ঞান প্রশংসনীয়, কিন্তু গ্রীক ভাষায় কিছুটা কাঁচা। তখন সেই ভাষায় তিনি তাকে সবল করলেন এবং অন্যান্য বিষয়েও শক্তসমর্থ করে ডবল প্রমোশন দিয়ে উপরের ক্লাসে

তুলে দিলেন। এতে অরবিন্দের কয়েক বছর বাঁচল। দেখ, গুণী ছাত্র পেলে শিক্ষকের কী রকম উৎসাহ ও আনন্দ হয়!

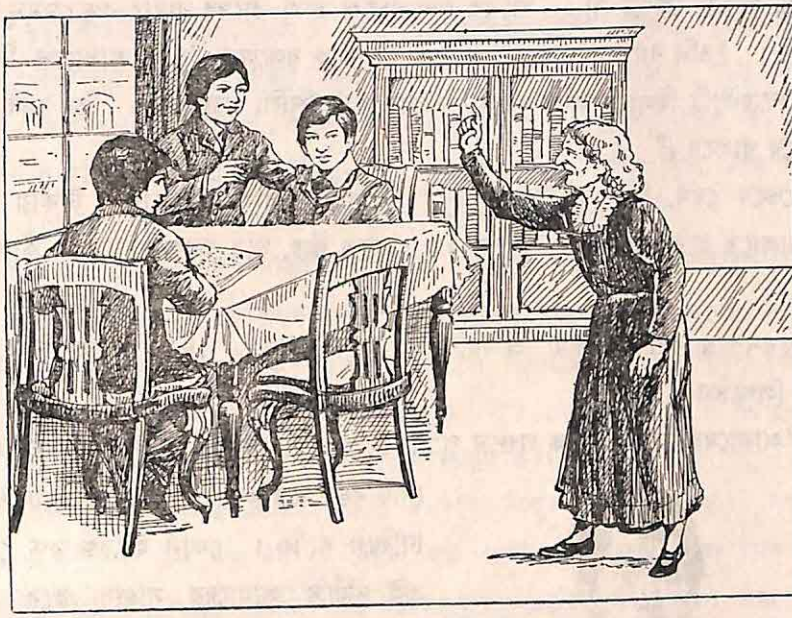
শিক্ষকদের সাহায্যে ও নিজস্ব প্রতিভায় অরবিন্দের ভিতরের ক্ষমতাগুলি ফুটতে লাগল। তীক্ষ্ণ, মেধাবী ছেলে বলে তাঁর খ্যাতি রটে গেল। ছাত্রদের আলোচনা সভায়ও নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে নাম হল। এমন সময় হঠাৎ কি একটা ঘটে গেল। অরবিন্দের পড়াশোনায় তেমন টান নেই। উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে। শিক্ষকদের বড় দুঃখ। "আহা, এমন ভাল ছেলেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কুঁড়েমিতে পেয়েছে।" এই বলে শিক্ষকরা খেদ করতেন। আসল ব্যাপারটি হল, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "আমি তখন বাইরের বই, নাটক-নভেল-কবিতা, ইতিহাস, ফরাসী সাহিত্য পড়তাম খুব আর নানা ভাষা শিখতাম। ক্লাসে পড়া অত্যন্ত সহজ ছিল বলে শুধু পরীক্ষার সময় একটু খাটতাম। তবুও মাঝে মাঝে যখন গ্রীক ও লাটিন ভাষায় কবিতা লিখতাম, শিক্ষকরা মুগ্ধ হয়ে বলতেন, 'এমন অসাধারণ প্রতিভা ছেলেটি হেলায় নষ্ট করছে।'

অরবিন্দ স্কুলে কাটালেন পাঁচ বছর। বাটারওঅর্থ (Butterworth) দ্বিতীয় পুরস্কার পেলেন সাহিত্যে, বেডফোর্ড (Bedford) পুরস্কার ইতিহাসে। ফাইনাল এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় বৃত্তি পেলেন যার ফলে কেম্ব্রিজে যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হল। লাটিন গ্রীকে কিরকম ভাল ফল হয়েছিল শুনবে পরে।

আর্থিক অবস্থা

এখন তিন ভাইএর আর্থিক অবস্থার কিছু খবর নিতে চেষ্টা করি। তোমরা নিশ্চয় ভেবেছ তারা যখন বড়লোকের ছেলে, খুব সুখে, স্বচ্ছন্দে, বিলাসিতায় কেটেছে তাদের জীবন। ম্যানচেস্টারের পাঁচ বছর সম্বন্ধে এটা কিছু সত্যি এবং ড্রুয়েট সাহেবের দয়ায় সেটা সম্ভব হয়েছে। বিলাসিতা অবশ্য নয়। কারণ শেষের দিকে ডাক্তার কৃষ্ণধন ছেলেদের খরচ নিয়মমত পাঠাতেন না। লণ্ডনে বুড়ী ড্রুয়েটের বাড়ি ছাড়ার পর দারুণ কষ্টে পড়তে হল তিন ভাইকে। বাবার কাছ থেকে টাকা আসা প্রায় বন্ধ।

তারা বুড়ীর বাড়ি ছাড়ল কেন, সে সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে। সেটা বলে নিই। বুড়ী ভয়ানক গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন, জান সে কথা। তাঁর বাড়িতে নিয়মিত বাইবেল পড়া, প্রার্থনা উপাসনা চলত। মাঝে মাঝে সে কাজের ভার পড়ত বড় ভাই বিনয়ভূষণের উপর। একদিন খাবার আগে যেই বাইবেল পড়া শেষ হয়েছে, মেজ ভাই



বুড়ী রেগে অগ্নিশর্মা

মনোমোহন বলে বসল, তার মেজাজটা সেদিন গরমই ছিল, "বেটা Moses (মোজেস)-এর উচিত শাস্তি হয়েছে। তার দলের লোকেরা অমান্য করেছে তাকে, বেশ করেছে।"

আর যায় কোথায়! বুড়ী রেগে অগ্নিশর্মা! Moses, যিনি একজন মস্ত ধর্মগুরু তাঁর সম্বন্ধে এমন অপমানজনক কথা! বুড়ী বললেন, "এই বিধর্মীদের সঙ্গে আর একটি রাতও কাটানো নয়, নইলে সমস্ত ছাদটা আমার মাথার উপর ভেঙে পড়বে।"

বুড়ী এই বলে পালালেন, ছেলেরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; কিন্তু তাঁর বাড়িও তাদের ছাড়তে হল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ পরে বলেছেন: "মেজদার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। বুড়ীর ছেলে কিন্তু ধর্মবিষয়ে জোরজবরদস্তি করেন নি। এই সময়ে আমি বেশ ভীরু ছিলাম। সব সময় সত্য কথা বলাও প্রয়োজন মনে করতাম না। কে ভাবতে পেরেছে যে আমি একদিন বিপ্লবীদল গড়ব? ফাঁসীকাঠে ঝোলবার সাহস হবে আমার? কত দোষত্রুটি ছিল আমার স্বভাবে! কত বাধাবিঘ্ন পার হয়ে তবে লাভ করেছি ভাগবত চেতনা! সে ইতিহাস শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে।"

এখন তিন ভাই পথে বসল। বাবার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই, টাকা-পয়সা

আসা বন্ধ, খাওয়া জোটে না। অনেক ভেবেচিন্তে তারা তাদের বাবার বন্ধু জেম্‌স্ কটনের শরণ নিল। তিনি ব্যাপারটি শুনে বড় ভাই বিনয়কে বললেন, "তুমি আমাদের লিবারেল ক্লাবের সেক্রেটারি হিসাবে কাজ কর। সপ্তায় পাঁচ শিলিং খরচ দেব। তিন ভাই ক্লাবের একটি ঘরে থাকবে।"

ভেবে দেখ, তিন ভাইকে মাত্র ৫ শিলিংএ অর্থাৎ তখনকার ৭ টাকায় খাওয়া-দাওয়া চালাতে হবে লণ্ডনের মতো শহরে! দারুণ শীত, ঘরে আগুন নেই। কী ভয়ানক পরীক্ষা!

তখনকার অবস্থার কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখে শোন। ১৮৯২ সালে তিনি ভারত সচিবকে লিখছেন:

"আমাদের তিন ভাইকে লণ্ডনে পাঠানো হয় যখন আমার বয়স সাত বছর। গত আট বছর ধরে আমরা নিজের চেষ্টায় খরচপত্র চালিয়ে যাচ্ছি। কোন ইংরেজ বন্ধু নেই যে এই দুর্দিনে আমাদের সাহায্য করে। বাবা নানা কারণে আমাদের নেহাৎ দরকারী খরচের টাকাও পাঠাতে পারছেন না। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন।" তাঁর শিষ্যদের কাছে তিনি বলেছেন: "একটি গোটা বছর কাটিয়েছি দুএক টুকরা স্যাণ্ডউইচ, সামান্য রুটি-মাখন আর এক কাপ চা খেয়ে; বিকেলে খেয়েছি এক পেনি দামের সস্তা সসেজ।"



লণ্ডনে সাত বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ

মনোমোহনের এই দারুণ কষ্ট অসহ্য হওয়ায় তিনি দু'ভাইকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। পরে অরবিন্দও আলাদা হলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর দুজন ভাল বাড়িওয়ালী (land-lady) জোটে, তারা ছিল 'angel' (দেবদূত)। মাসের পর মাস খরচ না দিলেও কিছু বলত না। পরে আই. সি. এস. (I. C. S.) বৃত্তির টাকা থেকে তিনি তাদের দেনা শোধ করেন।

একটা কথা তবে মনে রেখো : এত কষ্ট সত্ত্বেও ভাইরা বাবার উপর কোনদিন অসন্তুষ্ট হননি আর অরবিন্দ নিজের পড়াশোনাও অবহেলা করেননি। শুধু কি পড়া-শোনা ? কবিতা রচনা করতেন নিয়মিত। হাঁ, কবিতা। ইংরেজী, গ্রীক ও লাটিনে। তিনি জীবনে নানা কিছু চেষ্টা করেছেন, ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু কবিতা ছিল তাঁর আজীবন সঙ্গী। তাঁর শেষ বয়সের মহাকাব্য 'সাবিত্রী'র কথা যথাস্থানে শুনবে।

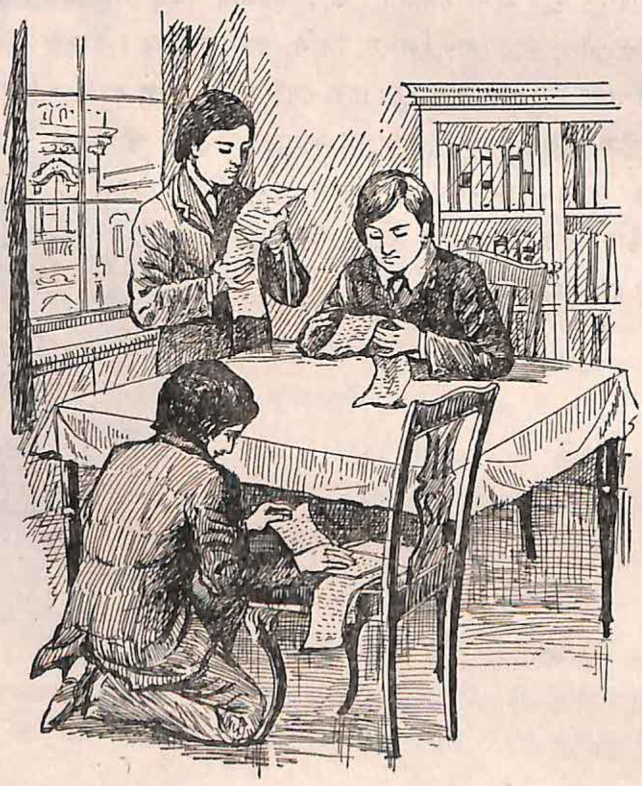
দারিদ্র্য আমাদের কাছে একটি বিভীষিকা। তার চাপে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় ; জীবনে কোন উন্নতি তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দারিদ্র্য শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভয়াবহ ছিল না, উদ্দীপন শক্তিও নয়। তাঁকে বহুদিন উপোসে থাকতে হয়েছে, তবুও তিনি কাবু হননি। পাঁচ-ছ'শো টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেড়শো টাকার চাকরি নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করেছেন। পণ্ডিচেরীতেও প্রথমে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী।

অসাধারণ তাঁর মনের জোর। তাঁর দৃঢ়তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। যখন তাঁর বয়স তের কি চৌদ্দ, তাঁর বোধ হল যে তিনি বড় স্বার্থপর। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে এই স্বার্থপরতা তাঁকে ছাড়তে হবে এবং সেই মুহূর্তে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে লেগে গেলেন। তাঁর ভীরুতার কথা তোমাদের বলেছি। সেই ভীরুতাও তিনি জয় করলেন মনের বলে। যখন কোন ব্যাপারে তাঁর ভয় হত, তিনি সেটাই করে বসতেন। এমনি করে তিনি তাঁর নিজের দোষত্রুটি শুধরে নিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে অরবিন্দ-চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

জননী জন্মভূমি

সেণ্ট পল্‌স্‌এ ছাত্রাবস্থায় অরবিন্দ ভাবতে লাগলেন নিজের দেশের কথা। শিশুকাল থেকে যিনি বিদেশে, যাঁর লেখাপড়া, চালচলন গড়ে উঠেছে বিদেশী শিক্ষায় ও আবহাওয়ায় এবং দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা যাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ, তাঁর পক্ষে জন্মভূমির প্রতি টান বিস্ময়জনক বই কি! একথা ঠিক, স্বাধীন দেশের হাওয়া গায়ে লাগলে আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা সচেতন হই। তবে অরবিন্দের ক্ষেত্রে এবিষয়ে সাহায্য করেছেন



লণ্ডনে বসে ছেলেরা সেই সব সংবাদ সাগ্রহে পাঠ করত

তাঁর নিজের পিতা, যিনি এক সময় কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা যেন যা কিছু ভারতীয় তা বিষবৎ বর্জন করে।

আর তিনিই নিজের আদেশ নিজে ভঙ্গ করলেন। কি করে? তোমাদের বলেছি কেমন করে তাঁর সাহেবপ্রীতিতে প্রথম ফাটল ধরল। সরকারের, সাহেবদের নানা অবিচার, নিষ্ঠুরতার কাহিনী দেশী কাগজে তিনি যত পড়তে লাগলেন, বিশেষ করে চা-বাগানের কুলি, কারখানার মজুর, স্টীমারের খালাসী ইত্যাদি গরিবদের উপর অত্যাচারের কথা, সেই ফাটল তত বাড়তে লাগল। খবরের কাগজ থেকে সে-সব সংবাদ কেটে তিনি ডাকযোগে ছেলেদের কাছে পাঠাতে লাগলেন। লণ্ডনে বসে ছেলেরা সেই সংবাদ সাগ্রহে পাঠ করত।

তোমরা দেখেছ যে সাহেবভক্ত হলেও তিনি দেশকে, দেশের গরিবদুঃখীদের গভীরভাবে ভালবাসতেন। এই ভালবাসা তিনি জাগিয়ে তুলতে চাইলেন নিজের ছেলেদের ভিতর। তবে তাতে পুরোপুরি সাড়া দিলেন শুধু অরবিন্দ। তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র' থেকে আমরা জানতে পাই, স্বদেশপ্রেম তাঁর জন্মগত, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য ভগবান তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। চৌদ্দ বছর বয়সে সেই ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং আঠার বছর বয়সে তাঁর মূল ও শিকড় সবল ও দৃঢ় হয়। উপরন্তু, আমার বিশ্বাস, স্বাধীন দেশের হাওয়া সেই ভাবকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে।

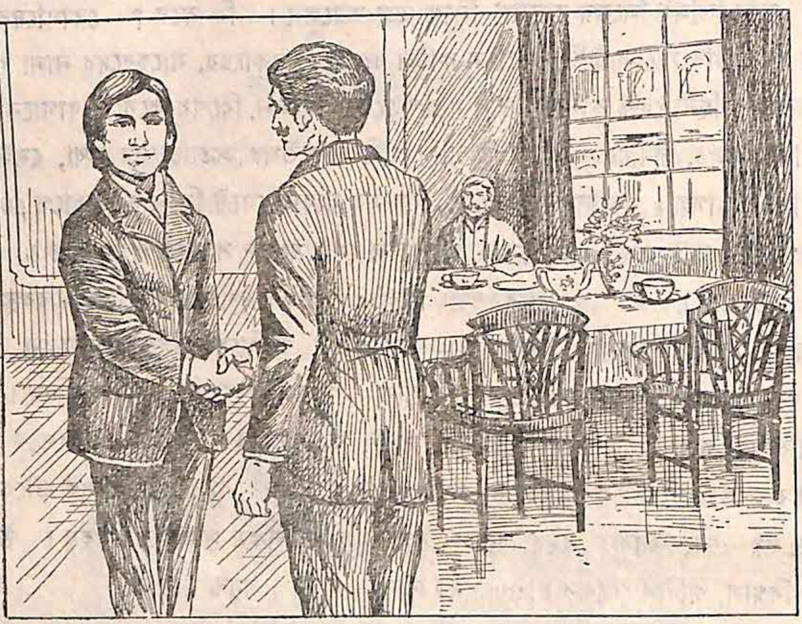
কেম্ব্রিজ: ১৮৯০-১৮৯২

সসম্মানে লণ্ডনে পড়া শেষ করে অরবিন্দ এলেন কেম্ব্রিজে, কিংস্ কলেজে। বয়স ১৭।১৮। বৃত্তি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে তাঁর কেম্ব্রিজে আসা এবং ভাইদেরও অর্থসাহায্য করা সম্ভব হল। পরীক্ষার ফল এত ভাল হয়েছিল যে কেম্ব্রিজের একজন পরীক্ষক, নাম প্রথেরো—তাঁকে Don বলা হয়—অরবিন্দকে নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করে কফি খাওয়ালেন এবং কেম্ব্রিজের অধ্যাপক অস্কার ব্রাউনিং—বিখ্যাত O.B.-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

O. B. বললেন, "দেখ, তের বছর ধরে আমি পরীক্ষার কাগজ দেখছি, কিন্তু ল্যাটিন, গ্রীকে তুমি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছ, তার তুলনা হয় না। আর, তোমার প্রবন্ধটি চমৎকার!"

এই কথাগুলি অরবিন্দ তাঁর বাবাকে লিখে জানান। পরে আমরা দেখব মিঃ প্রথেরো অরবিন্দের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কিরকম লড়েছিলেন।

অরবিন্দের কেম্ব্রিজ জীবন সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা হলঃ তিন বছরের ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস পরীক্ষা তিনি পাশ করলেন দু'বছরে এবং প্রথম শ্রেণীতে; কিন্তু



প্রথেরোর সঙ্গে করমর্দন এবং অস্কার ব্রাউনিংএর সঙ্গে পরিচয়

যেহেতু ডিগ্রি নিতে হলে তিন বছর থাকতে হত, তাই ডিগ্রি নিলেন না। তিনি বলেছেন, ডিগ্রি হল পরীক্ষাপাশের নিদর্শন এবং চাকরির প্রয়োজনে। পাস তো তিনি করেছেন। আর চাকরি? সত্যিকারের জ্ঞান থাকলে চাকরির অভাব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আই. সি. এস.-ও পাশ করলেন। একসঙ্গে দুটো বড় পরীক্ষা পাশ করা দস্তুরমতো কঠিন। বিশেষ করে আই. সি. এস. সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ছিল যে ওটা ভয়ানক শক্ত পরীক্ষা। শ্রীঅরবিন্দ সেই মত হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "মোটেই না। অতি সহজ।" অবশ্য, তাঁর কাছে যা সহজ, আমাদের কাছে কি তাই?

আই. সি. এস.

এইবার আই. সি. এস. সম্বন্ধে তোমাদের কাছে একটু সবিস্তারে বলা দরকার। এখন এর নাম আই. এ. এস। এক সময় আই. সি. এস.-এর খুব নাম ও দাম ছিল। এই পরীক্ষা পাশ করলে সরকারের যে-কোন উচ্চপদ পাওয়া যেত, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট

থেকে আরম্ভ করে গভর্নর পর্যন্ত। যেমন সম্মান, তেমন টাকা। ওরা নাকি সরকারি পদরূপ মুকুটের কোহিনূর মণি। আমাদের দেশের হীরের টুকরো ছেলেরা এই অমূল্য রত্নের জন্য লালায়িত হত। বিয়ের বাজারে তাদের দাম ছিল রাজার ছেলের সমান। কিন্তু আবার তারাই ছিল সরকারের অতি অনুগত ভৃত্য; নিজেদের স্বাধীন মতামত বলে কিছুই ছিল না।

অরবিন্দের বাবার অন্তরের বাসনা ছিল যে তাঁর অরো এহেন আই. সি. এস. পাশ করে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করবেন এবং কৃতী দেশশাসক হয়ে পিতার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। এটা যে বিদেশী সরকারের গোলামি, এই ভাব তাঁর বাবা কেন, কেউ সেদিন মনে স্থান দিত না। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সাহেব বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে রেখেছিলেন, ছেলে পাশ করে কোথায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বসবেন।

ভগবান অলক্ষ্যে হাসলেন। একেই ইংরেজীতে বলে Man proposes, God disposes—মানুষ ভাবে এক, ভগবান করান অন্য কিছু। গোলামিগিরিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, অথচ বাবাকে নিরাশ করা যায় না। তখন তিনি ফন্দি আঁটলেন যে লেখা পরীক্ষায় পাশ করে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় তিনি স্বেচ্ছায় ফেল হবেন। এতে দুদিকই বজায় থাকবে—বাবার কথাও রাখা হবে আবার গোলামিগিরি থেকেও অব্যাহতি। কাজেও তিনি তাই করলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে চাকরি দিল না।

এই খবর শুনে তাঁর সেই হিতৈষী অধ্যাপক প্রথেরো সাহেব সরকারের সঙ্গে বেজায় লড়লেন। তিনি তো ভিতরের খবর জানতেন না। সরকারের কাছে তিনি এক লম্বা চিঠি লিখলেন: আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে ঘোড়ায় চড়তে পারেননি বলে ঘোষকে আই. সি. এস. চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। তারপর অরবিন্দের লেখাপড়ার, চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখলেন তাঁর দারুণ অর্থকষ্টের কথা, যে কারণে ঘোড়ায় চড়া শেখবার জন্য তিনি শিক্ষক রাখতে পারেননি। সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে আবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয়।

সরকার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। দেওয়া হল সুযোগ; বহুবার লোক পাঠানো হল, চিঠি পাঠানো হল, পরীক্ষার তারিখ বদলানো হল, কিন্তু অরবিন্দকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। লোক ফিরে আসে, চিঠি ফেরত আসে—অরবিন্দ তখন লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, কিংবা পরীক্ষাস্থলে দেরিতে উপস্থিত হন। অগত্যা পরীক্ষক বিরক্ত হয়ে তাঁকে ফেল করাল; অরবিন্দ মনে মনে হাসলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, কেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন, তিনি উত্তরে বলেন, "কি করব? বাবার হুকুম, আর আমিও ছেলেমানুষ ছিলাম। যখন জানলাম, কি ধরনের কাজ আমায় করতে হবে, তখন চৈতন্য হল। বুঝলাম, ওসব নীরস ফাইল পড়া ও লেখার কাজ আমার ধাতে সইবে না। আমার টান কবিতায়, সাহিত্যে, ভাষা শেখায় আর দেশের কাজে। ভাগ্যিস ওদিকে যাইনি, নইলে অকেজো, কুঁড়ে বলে চাকরি থেকে আমায় বরখাস্ত করত!"

মনে রেখো, এত অল্প বয়সে এমন গৌরবের পদ হেলায় তুচ্ছ করা কম কথা নয় এবং অরবিন্দই তার প্রথম দৃষ্টান্ত। অরবিন্দ অনেক কিছুতেই প্রথম। এতে বোঝা যায় যে মান, যশ, অর্থ ইত্যাদির প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা ছিল না।

তবে চাকরি না পাবার আসল কারণ অরবিন্দের দেশভক্তি; কেম্ব্রিজের 'ভারতীয় মজলিসে' তাঁর জোরালো রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা। ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল হওয়া একটা ছুতো মাত্র।

মজলিস

তখন কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটা ক্লাব ছিল। নাম 'ভারতীয় মজলিস'। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মাঝে স্বদেশপ্রেম জাগানো, মাতৃভূমির প্রকৃত পরিচয় দেওয়া এবং যুবকদের রাজনৈতিক মতামত গঠন করা—এই ছিল মজলিসের উদ্দেশ্য। অরবিন্দ তার সভ্য, পরে সম্পাদক হলেন। সেখানে তিনি দারুণ বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিতেন। ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করতেন। ইংরেজ সরকার সেগুলি গোপনে সংগ্রহ করে রাখত। কাজেই একজন বিপ্লবীকে কি করে সরকার আই. সি. এস. মুকুট পরাতে পারে?

আমরা বলব, এতে শাপে বর হল। তিনি চাকরি পেলেন না; আসলে নিলেন না। তাঁর জীবন অন্যদিকে মোড় নিল এবং তিনি স্বদেশকে স্বাধীন করবার কাজে তাঁর সমস্ত জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম নিয়োগ করলেন। স্বাধীনতাই হল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-মন্ত্র।

কেম্ব্রিজ জীবন সম্বন্ধে আর বেশি কিছু আমরা জানি না। তবে তাঁর এক আইরিশ সতীর্থ একটি চিঠিতে লেখেন, "আমি অরবিন্দকে খুব চিনতাম। তার কথা মনে করে বেশ আনন্দ পাই। যেমনি তার মেধা, তেমনি মহৎ চরিত্র ও নম্র স্বভাব। যারা তাকে চিনত তারা সবাই তাকে ভালবাসত।"

আবার লণ্ডন

অরবিন্দ লণ্ডনে ফিরে এলেন ১৮৯২ সালের শেষে। দু'তিন মাস মাত্র ছিলেন, দেশে ফেরবার আয়োজন করেছিলেন। এইসময় বোধহয় চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকজন ভারতীয়দের একটি ছোট ক্লাবে ভরতি হলেন, চমকপ্রদ তার নাম—Lotus and Dagger (পদ্ম এবং ছোরা)। সভ্যদের উদ্দেশ্য, দেশকে স্বাধীন করা। তাদের শপথ গ্রহণ করতে হত যে দেশে ফিরে তারা সরকারি চাকরি নেবে না, দেশের সেবা করবে, কিন্তু কাজের বেলায় অরবিন্দ ছাড়া অন্য সবাই শপথের কথা ভুলে গেল।

শপথ তো তিনি নিলেন, কিন্তু দেশে গিয়ে খাওয়াপরা চলবে কি করে? আই. সি. এস. চাকরি ছেড়ে দিলেন। টাকা তো উপার্জন করতে হবে, খালি পেটে অথবা বাবার অন্ন ধ্বংস করে দেশের সেবা চলে না। এসব কথা যখন মনে মনে ভাবছেন, তখন ভগবানই যেন তাঁর সহায় হলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেখ, কী অদ্ভুতভাবে মাঝে মাঝে সমস্যার সমাধান হয়। যখন এই সমস্ত ভাবনা মাথায় আসছে, তখন খবর পেলাম লণ্ডনে বরোদার মহারাজা উপস্থিত। কটন সাহেবকে নিয়ে বড়দা ও আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার পরীক্ষার ফল ও অন্যান্য পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন এবং মাসে দু'শো টাকায় তাঁর স্টেটে একটি চাকরি মঞ্জুর করলেন। অন্তত পাঁচশো টাকায় শুরু হয় একজন আই. সি. এস.-এর চাকরি। কিন্তু আমরা ছিলাম এসব বিষয়ে অত্যন্ত আনাড়ি আর কটন সাহেবেরও কোন ধারণা ছিল না। পরে মহারাজা জোর গলায় বলতেন যে মাত্র দুশো টাকায় একজন 'সিভিলিয়ান'-কে তিনি পাকড়াও করেছেন। শুধু 'সিভিলিয়ান'! মহারাজা পরে হয়তো আরও বলতেন, 'সিভিলিয়ান' আমি পেতেও পারি কিন্তু আর একটি অরবিন্দ পাব না। কোহিনূর একটিই।

মহারাজার প্রসঙ্গ যখন এল, দরজির গল্পটা সেরে নিই। ইংরেজ জাতের বণিকসুলভ প্রবৃত্তির খাসা নমুনা। অরবিন্দ যখন লণ্ডনে চলে এলেন, তাঁর কেম্ব্রিজ-পরিচিত দরজিও কি করে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে লণ্ডনে উপস্থিত হল। অরবিন্দ মনোমোহনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে মনোমোহন একটা বেশ শোভন 'সুট' করালেন কিন্তু দেশে ফিরলেন তার দাম না দিয়ে। কয়েক মাস পরে ভারত সরকার ও বরোদার মহারাজার কাছে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে দুটো নালিশ হাজির যে তাঁরা দরজির বকেয়া না দিয়ে চলে এসেছেন। অরবিন্দ মহারাজাকে জানালেন যে তিনি দরজির সমস্ত

প্রাপ্য শোধ করে দিয়েছেন, কেবল চার পাউণ্ড দেননি, কেননা, সে তাঁর কাছ থেকে বরাবর ডবল দাম উশুল করেছে, কাজেই তার নালিশ মিথ্যা। মহারাজা বললেন, "এর জন্যে গোলমাল করে লাভ নেই, দিয়েই ফেল।"

অরবিন্দ এখন দেশে রওনা হবেন। তাঁর আই. সি. এস. পরীক্ষা পাশের বাবদ ১৫০ পাউণ্ড পেলেন, সমস্ত দেনা তিনি শোধ করলেন। ১৮৯৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফেরবার জন্য 'কার্থেজ' জাহাজের টিকিট কিনলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর বাবা একমাসের ছুটি নিয়ে বম্বে এলেন কৃতী ছেলেকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যাবেন বলে, অথচ ছেলের দিক থেকে কোন খবর নেই। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন। কয়েকদিন পরে তাঁর ব্যাঙ্কার গ্রীণ্ডলে কোম্পানি ভুল খবর পাঠাল যে তাঁর ছেলে দেশে রওনা হয়েছে। স্টীমারের নামটাও ভুল করে বসল। আর, এমনি অদৃষ্ট যে সেই স্টীমারটা পর্তুগালের কাছে সমুদ্রে ডুবে গেল। একটি যাত্রীও বাঁচল না। পরের দিন কাগজে কাগজে সেই নিদারুণ খবর ছাপা হয়ে গেল। ডাক্তার কৃষ্ণধনের মাথায় বাজ পড়ল। তিনি এমন সাংঘাতিক 'শক' পেলেন যে তাঁর হার্টে ভয়ানক যন্ত্রণা হল এবং অরোর নাম করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অথচ অরবিন্দ সে জাহাজে রওনা হননি। সামান্য একটি ভুলে কি ওলটপালট ঘটতে পারে দেখ!

ছেলেকে তিনি কী ভালই বাসতেন। ১৮৯০ সালে তিনি তাঁর শ্যালককে লিখেছিলেন :

"যে তিনটি ছেলেকে আমি জন্ম দিয়েছি তাদের আমি কৃতী ও গুণবান করেছি··· অরো তার অসাধারণ শাসন দক্ষতায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি সেদিন বেঁচে থাকব না, কিন্তু তুমি হয়তো থাকবে, তখন এই চিঠির কথা স্মরণ ক'রো।" কী মর্মান্তিক আঘাত তিনি পেলেন তাহলে বুঝতে পার!

পঞ্চম অধ্যায়

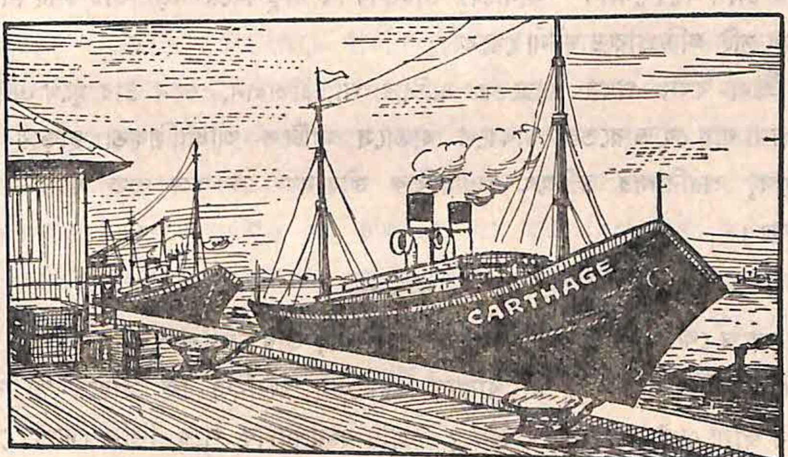
ভারতবর্ষ

১৮৯৩ সালে চৌদ্দ বছর বনবাসের পর বালক অরবিন্দ যুবক অরবিন্দ বেশে দেশে ফিরছেন। তিনি তো জানতেন না বাবার মৃত্যুর কথা, মায়ের অবস্থাও বোধহয় তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কত আগ্রহ, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিরছেন দেশে। বয়স তাঁর একুশ। একদিকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে গভীর দুঃখ, অন্যদিকে তীব্র আনন্দ, দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘরে, মাতৃভূমিতে ফেরবার পুলক।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কার্থেজ স্টীমার অরবিন্দকে নিয়ে এপোলো বন্দরে ভিড়ল। মাতৃভূমি দর্শনে তাঁর মনে পড়ল কি বঙ্কিমের

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ?

ভারতমাতা তাঁর প্রিয় সন্তানকে অভ্যর্থনা করলেন অভাবনীয় উপায়ে। যেইমাত্র তিনি ভারতের মাটিতে পা দিলেন, এক অপরূপ অভিজ্ঞতা হল তাঁর যা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।



কার্থেজ স্টীমার অরবিন্দকে নিয়ে এপোলো বন্দরে ভিড়ল

তিনি অনুভব করলেন :

"এক বিশাল অসীমতা বিশ্বচরাচর ছেয়ে আছে। সকল বস্তুতে, সকল দেহে বাস করছে অন্তরাত্মা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে নেমে এল এক বিপুল নীরবতা ; গভীর শান্তি আমায় ঘিরে ধরল। বহুমাস ধরে এই অনুভূতি বজায় ছিল। এটা আমার প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ; আর এল কিনা একেবারে বিনা নিমন্ত্রণে। কল্পনার অতীত! এর পর নানা রকমের অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে গেল।"

পরবর্তীকালে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি কোন যোগ করেননি, ভগবানেও বিশ্বাস করতেন না, তবুও কি করে এত বড় অভিজ্ঞতা হল যা বহু বছর সাধনার পরে হয়ে থাকে ?

তিনি উত্তর দিলেন, "তা আমি কি করব ? আমি তো চাইনি, এর সম্বন্ধে কিছু জানতামও না, তবুও এল।"

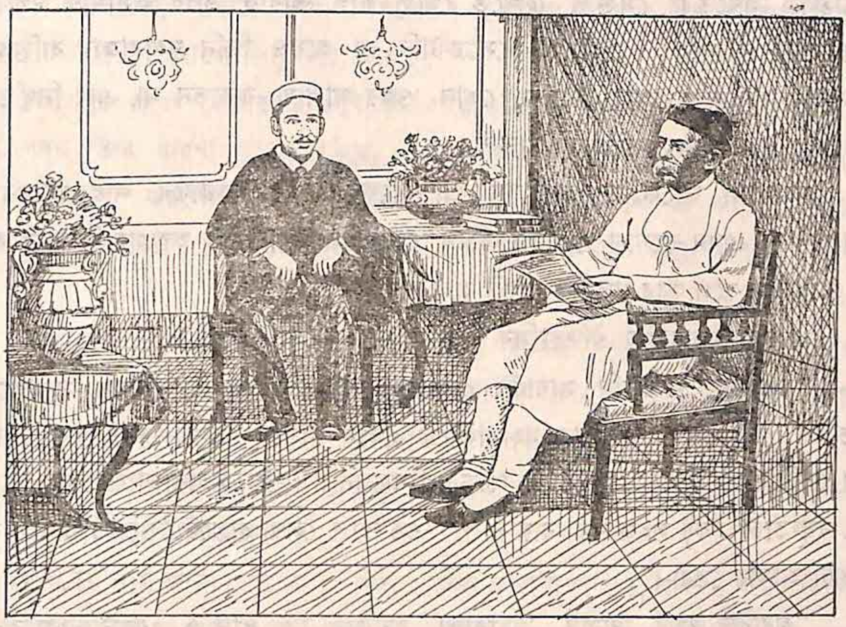
ম্যাক্সমুলার-সম্পাদিত একটি বই পড়ে তিনি আত্মার কথা প্রথম জানতে পারেন। তৎক্ষণাৎ সংকল্প করলেন যে আত্মা কী জানতে হবে। এই অভিজ্ঞতা কি সেই সংকল্পসিদ্ধির আভাস ?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। তাঁর মাঝে যে একটা বিরাট আঁধার বাসা বেঁধেছিল, সেই দার্জিলিংএ পড়ার সময় থেকে, সেই আঁধার তাঁকে এখন অকস্মাৎ ত্যাগ করে গেল। আমাদের ভারতবর্ষ কি ধাতু দিয়ে গড়া তার নিদর্শন পাওয়া যাবে এই দুটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা থেকে।

শ্রীমা যখন প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন, তখন তাঁর মুখে এই ধরনের কথা শোনা যায় যে ভারতের আকাশে বাতাসে মাটিতে আধ্যাত্মিকতা ছড়িয়ে আছে। যাই হোক, অরবিন্দের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনের এই হল শুভ সূচনা—আলোর পথে যাত্রা।

বরোদা

বোম্বে থেকে অরবিন্দ রওনা হলেন বরোদায়, তাঁর চাকরিতে যোগ দিতে। তোমরা আমরা হলে ছুটতাম প্রথমে মা বাবাকে দেখতে। অরবিন্দ কি কারণে তা করেননি আমাদের জানা নেই। শুধু কি তাই ? প্রায় বছরখানেক পরে তিনি দেশে গেলেন। হয় তিনি বাবার মৃত্যু ও মায়ের মানসিক অসুস্থতার কথা শুনেছেন, নয়তো তাঁর কাছে কর্তব্য বড় মনে হয়েছে। কারণ যাই হোক, এটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক লাগে।



অরবিন্দ ও মহারাজা সায়াজী রাও

কিন্তু মনে রাখা দরকার, অরবিন্দ সর্বপ্রকারে অসাধারণ। আমাদের মানুষী বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার চলে না।

মহারাজা সায়াজী রাও অরবিন্দকে নানা দপ্তরে কাজ দিলেন, যেমন স্ট্যাম্প অফিস, খাজনা বিভাগ, সেক্রেটারিয়েট, ইত্যাদি, যেগুলির সঙ্গে তাঁর মনের কোন মিল থাকতেই পারে না। অবশেষে তিনি কৌশল করে বদলি হলেন বরোদা কলেজে, প্রথমে ফরাসী ভাষার, পরে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক হয়ে। শেষে ভাইস প্রিন্সিপালের পদ পেলেন।

তোমরা প্রশ্ন করবে, এটাও তো চাকরি! তা বটে, কিন্তু আই. সি. এস.-এর সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এটা হল দেশী রাজার অধীনে, অন্যটি বিদেশী রাজার, সাহেবের গোলামি; সাহেবের কথায় উঠতে বসতে হয়; তোমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। এখানে মহারাজা সর্বেসর্বা; স্বাধীনতা ঢের বেশি। অরবিন্দের বাবার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ কর।

তোমরা দেখবে মহারাজা অরবিন্দকে কিরকম শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। নিয়মিত কাজ ছাড়াও তাঁকে মহারাজা প্রায়ই ডাকতেন নানা জরুরি বা গোপনীয় সরকারি দলিল

অ—৫

বা চিঠিপত্র লিখতে। সেগুলি লিখতে গেলে চাই ভাষার উপর অসামান্য দখল এবং কথার সতর্ক ব্যবহার। প্রাইভেট সেক্রেটারি না হয়েও তিনি মহারাজার ব্যক্তিগত ও শাসনসংক্রান্ত কাজ করে দিতেন, কোন ওজর-আপত্তি করতেন না, এবং নিখুঁতভাবে করতেন। এটা ছিল অরবিন্দের স্বভাব।

মহারাজা তাঁকে সকালবেলার প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করতেন আর এই সব কাজ চাপাতেন। এমন সুযোগ পেয়েও তিনি কোনদিন মহারাজার অনুগ্রহ ভিক্ষা করেননি, বরং প্রয়োজন হলে তাঁর মতামত স্পষ্ট বলে দিতেন।

একজন মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন :

"অরবিন্দ ও আমি সায়াজী রাওয়ের প্রাসাদে প্রায়ই যেতাম সকালবেলায় প্রাতরাশ ভোজনে। একবার মহারাজাকে কোন সভায় বক্তৃতা দিতে হবে; অরবিন্দ সেটা তৈরি করে দিলেন এবং তাঁকে পড়ে শোনালেন। শুনে মহারাজা বললেন, 'অরবিন্দ বাবু, বক্তৃতাটা একটু সহজ করা যায় না? এত ভাল লেখা হয়েছে যে কেউ বিশ্বাস করবে না এটা আমার তৈরী।'"

"অরবিন্দ উত্তর দিলেন, 'মহারাজা, বদলিয়ে কি লাভ? একটু সহজ করলেও লোকে কি বুঝতে পারবে না যে এটা আপনার লেখা নয়? ভাল হোক মন্দ হোক, তারা বলবেই মহারাজার সব বক্তৃতা অন্যেরা লিখে দেয়। তাতে কোন দোষ নেই; তবে দেখতে হবে ভাবগুলি আপনার কিনা।'"

এই বইতে অরবিন্দ সম্বন্ধে আর একটি কৌতূহলজনক উল্লেখ আছে :

"অরবিন্দ কথা বলতেন খুব কম। প্রশ্নের জবাব দিতেন দুটি কথায়, 'হাঁ' অথবা 'না'। যোগীর লক্ষণ, সন্দেহ নেই।"

জ্ঞান-তপস্বী

বরোদায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই অরবিন্দ পড়াশোনায় গভীর মনোযোগ দেন। বিলাতে প্রবাসকালে একুশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অর্জন ও আয়ত্ত করেছেন কিন্তু নিজের দেশ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতেন না; সে অভাব পূরণে তিনি নিবিষ্ট হলেন। দেশের ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, সভ্যতা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকে, তাহলে দেশের কাজ করবেন কি করে? তাই সংস্কৃত শিখলেন নিজের চেষ্টায়। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, গীতা, কালিদাস, ভবভূতি

পড়লেন। গুজরাটী, মারাঠী ভাষা শিখলেন। এইভাবে চলল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি। এ সম্বন্ধে আরও কিছু পরে বলব।

ছ'মাসের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নেতাদের কাজকর্ম ও মনোভাব সম্বন্ধে যখন তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছে, সেই সময় তাঁর এক কেম্ব্রিজ-বন্ধু দেশপাণ্ডে তাঁকে অনুরোধ করলেন, তাঁর ইংরেজী কাগজ 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু লিখতে। মজলিসে অরবিন্দের তেজস্বী বক্তৃতার কথা নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল।

তিনি পর পর কয়েকটি নিবন্ধ লিখলেন, নাম দিলেন "পুরোনো প্রদীপের পরিবর্তে নূতন প্রদীপ"। লেখকের নাম ছিল না, কারণ অরবিন্দ তখন সরকারী চাকরিতে বহাল। প্রথম দুটি লেখা প্রকাশ হবার পরেই চারদিকে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কে এই লেখক ? কার এই তীব্র জোরালো ভাষা ? এমন সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সমালোচনা সরকারের ও দেশের নেতাদের রাজনীতি সম্বন্ধে ?

লেখকের নাম জানা গেল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ মারাঠী পণ্ডিত, জজ ও মডারেট নেতা রানাডে সম্পাদককে সাবধান করে দিলেন যে বিদেশী রাজার বিরুদ্ধে তাঁর কাগজে এরকম গরম লেখা বের হলে তাঁকে সরকার গ্রেপ্তার করবে।

বেচারা দেশপাণ্ডে অরবিন্দের দ্বারস্থ হয়ে ব্যাপারটা তাঁকে জানালেন। অরবিন্দ বন্ধুকে বাঁচালেন। কি ভাবে ? শোন, তিনি বলছেন :

"বরোদায় এসেই বুঝতে পারলাম তখনকার কংগ্রেসের মতিগতি। সরকারের মন জোগানো কথা বলা, তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করা—এই ধরনের বুলিতে নেতাদের লেখা, বক্তৃতা ভরতি। ভয়ানক বিতৃষ্ণা হল তাদের এই ভিক্ষাবৃত্তিতে। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। তাতেই তারা ভয়ে কাবু। দেশপাণ্ডে আমায় অনুরোধ করল, এরকম রক্ত-গরম লেখার বদলে নরম নিরুপদ্রব কিছু লিখতে। আমার তাতে কোন স্পৃহা রইল না। অন্য কোন বিষয়ে দু-তিনটি প্রবন্ধ লিখেই থামিয়ে দিলাম।"

এই গরম লেখার সামান্য নমুনা দিচ্ছি :

"আমি কংগ্রেসকে বলছি তার উদ্দেশ্য ভুল, উদ্দেশ্য সাধনের পথ ভুল, কারণ তার আন্তরিকতা নেই, নেই আত্মদান। যারা নেতা, তারা নেতৃপদের অযোগ্য ! আমরা যেমন অন্ধ, আমাদের যারা চালাচ্ছেন তারাও তেমন অন্ধ, অন্ততপক্ষে একচক্ষুওয়ালা। রাজনীতি কি ? চিন্তার দ্বারা অথবা সহজাত অনুভূতির সাহায্যে আমাদের অবস্থার পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি

লাভ করা এবং দক্ষতার সহিত তাকে কাজে লাগানো—এই হল রাজনীতির রহস্য, আর এটাই আমরা করতে পারিনি।"

এ হল অরবিন্দের প্রথম বোমা নিক্ষেপ। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ আর নেতারা পঞ্চাশের উপরে। এই প্রকৃতির নেতাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলেছিল বহু বছর ধরে। যাদের দূরদৃষ্টি ছিল, তারা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছিল যে একদিন এই যুবক ভারতের নেতা হবেন। তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, ব্যাপক দৃষ্টি, ভাষার উপর দখল, সাহস, আন্তরিকতা, জ্বলন্ত দেশভক্তি—একাধারে এতগুলি গুণ বিরল।

এই 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ বঙ্কিমের সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।

বছরখানেক পরে অরবিন্দের ইচ্ছা বা সময় হল নিজের দেশ দেখবার। দেশ মানে দেওঘর, মামার বাড়ি। সেখানেই মা ও ভাইবোন থাকত দাদামশাই ও মামাদের সঙ্গে। দাদামশাই স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসু। বৃদ্ধ, ঋষিতুল্য পুরুষ। অরবিন্দকে পেয়ে সবাই উল্লসিত। ছোট বোন সরোজিনী লিখছেন :

"লম্বা চুল, কোমল মুখ, সেজদা অত্যন্ত লাজুক।" অরবিন্দের মা কিন্তু ছেলেকে চিনতে পারলেন না। তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, "এ আমার অরো নয়, আমার অরো তো এতোটুকু! আচ্ছা, অরোর আঙ্গুলে একটা কাটা দাগ ছিল, কই সেই দাগ?" দাগ দেখার পর মা নিশ্চিন্ত।

দেশ থেকে ফেরবার পথে বম্বেতে রানাডের সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। রানাডে বললেন, "তুমিই ওসব নিবন্ধের লেখক? কেন, বাপু, কংগ্রেসকে এমন কঠোরভাবে আক্রমণ করছ? তার চাইতে আমাদের জেলগুলির উন্নতিকল্পে কিছু লেখ না কেন? তাতে ঢের ভাল কাজ হবে।" পরে শ্রীঅরবিন্দ হেসে শিষ্যদের বলেন, "জেল-সংস্কারের জন্যই বোধহয় আমায় জেলে যেতে হয়েছিল।"

দেশ থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ প্রথম চিঠি লিখলেন ছোট বোন সরোকে। ভারি সুন্দর, স্নেহ ও হাস্যরসে ভরা চিঠিটি; অবশ্য ইংরেজী ভাষায় লেখা। তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয় ও বাংলাদেশের প্রতি টান চমৎকার ফুটে উঠেছে শুধু একটি বাক্যে: "দেশ থেকে ফিরে এসে বরোদাকে দশ গুণ বরোদা মনে হচ্ছে।" অথচ পরে দেখবে, যখন তিনি কাজে ডুবে গেলেন তখন সেই টান কোথায় তলিয়ে গেল! তখন বছরে একবার পূজার

সময় তিনি দেশে যেতেন। তাঁর মাসতুতো বোন বাসন্তী* 'গল্পভারতী'তে দাদার একটি বর্ণনা দেন :

"অরো দাদা যখনই ছুটিতে আসতেন, সঙ্গে আনতেন দু'তিনটি বাক্স। আমরা ভাবতাম, দামী সুট, সেণ্ট ইত্যাদি নানা শখের জিনিসে বাক্স ভরতি থাকবে। কিন্তু দেখতাম শুধু বই, বই আর বই। তাই বলে তিনি নীরস ছিলেন না মোটেই, আমাদের গল্পগুজবে যোগ দিতেন। কথাবার্তায় তাঁর হাস্যকৌতুক উছলে পড়ত। তিনি বড়মামার সঙ্গে বেশ রঙ্গ করতেন, তাঁকে ডাকতেন, ইসবগুলের পয়গম্বর! কারও পেটের অসুখ হলেই মামা বলতেন, 'ইসবগুল খাও, সেরে যাবে'।"

একবার দেশ থেকে তিনি দীনেন্দ্রকুমার রায় নামে একজন সাহিত্যিককে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। উদ্দেশ্য হল, তাঁর কাছে বাংলা শেখা, বিশেষ করে কথাবার্তা বলা। সাধু বাংলা তিনি ভালই জানতেন। কেম্ব্রিজে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য বাংলা শেখেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন ভারতফেরত এক সাহেব। তাঁর বিদ্যার দৌড় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়। একদিন অরবিন্দ মজা করবার জন্য তাঁকে বঙ্কিমের লেখা বাংলা পড়ে শোনালেন। তিনি বললেন, ওটা বাংলাই নয়।

দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের সঙ্গে দুবছর বাস করেন। পরে তাঁর সম্বন্ধে একটি মনোরম ছোট বই লেখেন ; 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' তার নাম। তাতে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা আমরা জানতে পাই। তিনি লিখেছেন :

"অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তিনি দেখিতে প্রকাণ্ড জোয়ান হইবেন, চোখে চশমা, আপাদমস্তক হ্যাটকোটবুটে মণ্ডিত, মুখে বাঁকা বাঁকা বুলি, চক্ষুতে কটমট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ। আর দেখিলাম, পায়ে সুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে মোটা ধুতি, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ! দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত—'ঐ হিমালয়,' তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।"

---

* 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক দেশসেবক কৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়ে। তাঁদের বাড়িতে অরবিন্দ মাঝে মাঝে থাকতেন।

তিনি আরও বলছেন :

"যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁর হাসি শিশুর হাসির মত সরল, তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।...মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা! দিবারাত্রি একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম অরবিন্দ এই পৃথিবীর মানুষ নহেন; অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা।...বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। তিনি লৌহখট্টায় শয়ন করিতেন, মাঘমাসের শীতেও অরবিন্দকে কোনদিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই...ব্রহ্মচর্যনিরত, পরদুঃখকাতর



বরোদায় অরবিন্দের পাঠকক্ষ

আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন তাঁহাকে অন্য কিছু মনে হইত না। যেন জ্ঞান সঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন!"

অরবিন্দের জ্ঞান সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দোকান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 'রেল পার্শেলে' পুস্তকগুলি আসিত। অরবিন্দ সকল কেতাব আট দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত। এমন সর্বভূক পাঠক আর কখনও দেখি নাই।"

মহারাজা অরবিন্দকে কি রকম শ্রদ্ধা করতেন তা দীনেন রায়ের জবানীতে শোন :

"এক এক দিন সকালে বা বৈকালে এক এক জন অস্ত্রধারী তুরুকসোয়ার 'লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ' হইতে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র লইয়া অরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইত। তিনি কোনদিন লিখিতেন, 'আজ আপনি মহারাজের সহিত ডিনারে যোগদান করিলে তিনি বড় আপ্যায়িত হইবেন।' না হয় লিখিতেন, 'মহারাজের সহিত অমুক সময় একবার আপনার সাক্ষাতের কি অবসর হইবে?'—ইত্যাদি। সময়ের অভাববশতঃ অরবিন্দ কখনও কখনও মহারাজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এমনও দেখিয়াছি! কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাতের জন্য মাসের পর মাস ধরিয়া উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন, আর সামান্য 'স্কুল মাস্টার' অরবিন্দ মহারাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্তব্যকে অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিতেন!"

মহারাজা একদিকে তাঁকে সমীহ করতেন, অন্যদিকে চাইতেন যে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করুক। তিনি একবার হুকুম জারি করলেন যে সব কর্মচারীদের বন্ধের দিন, শনিবার আর রবিবারে অফিসে আসতে হবে। অরবিন্দ কিন্তু সে হুকুম মানলেন না। মহারাজা শুনে আগুন। ভাবলেন, তাঁকে দারুণ শাস্তি দেবেন; পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলেন। অরবিন্দ শুনে বললেন, "বেশ! যত ইচ্ছা জরিমানা করুক, আমি জরিমানা দেব না, অফিসও করব না।" মহারাজার মাথায় সুবুদ্ধি এল। তিনি জবাব শুনে চুপ করে গেলেন।

দীনেন রায় অরবিন্দকে কোনদিন রাগ করতে দেখেননি। কিন্তু অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর খড়্গহস্ত ছিলেন। যেমন কোমল, তেমনি আবার কঠিন। তাই বলে তিনি মহারাজার গুণাবলীর প্রশংসা করতে ভোলেননি। বলেছেন, "মহৎ লোক ছিলেন তিনি। একটা রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার।"

অরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দীনেন রায় লিখছেন :

"আমি যে সময় বরোদায় ছিলাম, সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। তিনি একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, একটি পয়সাও অপব্যয় ছিল না ; তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে একটি পয়সাও থাকিত না।"

টাকাপয়সার কথা যখন উঠল, শোন তাহলে আর একজনের জবানী; তাঁর নাম ফটকার। বরোদার এ্যাডভোকেট, অরবিন্দের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি লিখছেন :

"...আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি ; অরবিন্দের টাকার প্রতি কোন লোভ ছিল না। তিন মাসের মাইনে তিনি পেতেন একসঙ্গে আর সেগুলি একটি 'ট্রে'তে ঢেলে রাখতেন। খরচের কোন হিসাব রাখতেন না। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি ওভাবে টাকা রাখেন। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'এতে বোঝা যায়, আমরা সৎ-লোকের সঙ্গে বাস করছি, তাই না ?'

'কিন্তু হিসাব না রাখলে সেটা বুঝবেন কি করে ?'

শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, 'ভগবান আমার হিসাব রাখেন। আমার যা দরকার তাই তিনি দেন, বাকিটা নিজের জন্য রেখে দেন। আমায় তো তিনি কোন অভাবে রাখেননি, কাজেই শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করব কেন ?"

এই হলেন অরবিন্দ। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

তিনি মা ও ভাইবোনের জন্যে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। তাঁর অন্য দুই ভাই পাঠাতেন কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "বড় ভাই কোচবিহার স্টেটে কাজ করেন, তাঁকে ঠাট বজায় রাখতে হয়। মনোমোহন বিয়ে করেছেন। বিয়ে হল ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা।"

অরবিন্দের উদারতার একটি গল্প শোন দীনেন রায়ের ভাষায় :

"অরবিন্দ মনিঅর্ডারে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেছেন দেখিয়া আমার মনে হইল এই সুযোগে কিছু টাকা চাহিয়া লইয়া আমিও বাড়িতে পাঠাই। টাকা চাহিলাম। অরবিন্দ হাসিয়া ব্যাগে যে স্বল্পাবশিষ্ট টাকা ছিল, আমাকে দিয়া বলিলেন, 'আর তো নাই, এ ক'টা টাকা আপনিই পাঠাইয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'সে কি কথা ? আপনি টাকা পাঠাইবেন বলিয়া মনিঅর্ডার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে!...আমি পরে পাঠাইব।' অরবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা হয় না, আমার চেয়ে আপনারই দরকার বেশী, আমি পরে পাঠাইলেও ক্ষতি নাই।' এই বলিয়া তিনি মহাভারত খুলিয়া 'সাবিত্রী ও সত্যবান'-এর উপাখ্যান অবলম্বনে কবিতা লিখিতে বসিলেন।"

কাব্যচর্চা

অরবিন্দ এক সময় বলেছিলেন, তিনি প্রথমে কবি, পরে অন্য কিছু। কাব্যচর্চা তাঁর বিলেত থেকে শুরু। মনোমোহন তাঁকে এতে প্রেরণা দেন। মনোমোহনের কবিবন্ধু লরেন্স বিনিয়ন অরবিন্দের কবিতা দেখে বলেছিলেন, "তুমি আরও বেশি লেখ না কেন? এমন ক্ষমতা রয়েছে তোমার!"

দীনেন রায়ের উক্তিতে :

"অরবিন্দ রোজ সকালে নিয়ম করিয়া কবিতা লিখিতে বসিতেন। দশটার পর স্নান সারিয়া আবার বসিতেন এবং সকালে যতটুকু লেখা হইত, তাহাই আবৃত্তি করিতেন।"

এই সময় তাঁর প্রথম কবিতার বই *Songs to Myrtilla* প্রকাশ হয়। *Love and Death* এবং অন্যান্য বহু কবিতা তিনি রচনা করেন খুব দ্রুতগতিতে। 'সাবিত্রী' (*Savitri*) কাব্যও এখানেই তিনি আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন পণ্ডিচেরীতে। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি কাব্যচর্চা বজায় রাখেন।

অদ্ভুত একাগ্রতা

অরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যার কথা তোমাদের বলেছি। এখন শোন তাঁর অদ্ভুত তন্ময়তার গল্প। ফটকার বলেছেন :

"তিনি পড়ায় এমনই ডুবে যেতেন যে বাইরের জগতের কোন বোধই থাকত না। সন্ধ্যাবেলায় চাকর খাবার দিয়ে গেছে, কোন সাড়া নেই। শেষকালে চাকর আমায় অনুরোধ করল সাহেবকে মনে করিয়ে দিতে। আমি তাঁকে ডাকলাম, তিনি হেসে খেতে বসলেন আর অল্প সময়ের ভিতরে খাওয়া শেষ করে আবার বই নিয়ে বসলেন।"

একই সাক্ষ্য দিয়েছেন চারুচন্দ্র দত্ত, অরবিন্দের বন্ধু ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মী। তিনি লিখেছেন :

"একদিন অরবিন্দ কলেজ থেকে ফিরে একটি নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছেন ; আমরা পাশে দাবা খেলছি। আধঘণ্টা পরে বইটা রেখে দিয়ে তিনি এক কাপ চা খেলেন। আমরা আগেও তাঁর এই ধরনের অভ্যাস লক্ষ্য করেছি এবং একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে, তিনি মোটেই পড়েছেন কিনা। যে কোন জায়গা থেকে আমরা কিছু পড়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বলুন, পরে কি ঘটেছে।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে সেই পৃষ্ঠার বিবরণ দিলেন, একটাও ভুল হল না।"

চারু দত্ত বলেছেন, "তিনি যোগী না হবেন কি তবে আমরা যোগী হব?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনীতি ঃ বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

কাব্যচর্চা ও শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ একটি বিপ্লবীদল গঠনের কার্যে মন দিলেন। ইতিহাস পড়ে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে বিপ্লব ছাড়া কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হতে পারে না। তিনি বলেছেন, তাঁর রাজনীতির তিনটি ধারা ছিল। প্রথমটি হল বিপ্লব : একটা বিপ্লবী দল গঠন এবং বিপ্লবমূলক চিন্তা প্রচার করা ; এটা নিয়েই তিনি কাজ আরম্ভ করেন যাতে দেশ সশস্ত্র-বিদ্রোহের জন্যে তৈরী হতে পারে। দ্বিতীয়, প্রকাশ্য আন্দোলন, যাতে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে। অধিকাংশ ভারতবাসী মনে করত পূর্ণ স্বাধীনতা পাগলের প্রলাপ। ব্রিটিশরাজ এতই শক্তিশালী যে আমাদের মতো নিরস্ত্র এবং দুর্বল জাতির পক্ষে সে চেষ্টাই বৃথা। তৃতীয়, জনসাধারণকে অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্যে তৈরী করা যার ফলে বিদেশী শাসনযন্ত্র অচল হয়ে পড়বে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা স্মরণ কর।

সেই সময় যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এত মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। বন্দুকই ছিল প্রধান অস্ত্র ; কামান তেমন কার্যকরী ছিল না। ভারতবর্ষ অস্ত্রহীন হলেও বিদেশী রাজ্যের সাহায্যে এবং নিজেদের চেষ্টায় সে অভাব পূর্ণ হতে পারত। আমাদের বিশাল দেশের তুলনায় মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধে পরাস্ত করা অসম্ভব ছিল না, যদি অবশ্য জনসাধারণ আমাদের পক্ষে দাঁড়াত। ভারতীয় সৈন্যদলেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল।

এই হল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। প্রথম কয়েকবছর তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে ছিলেন (ইন্দুপ্রকাশে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া)। দেশের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল এবং শিক্ষিত সমাজও তাঁকে জানল, তখন তাঁর প্রথম কাজ হল যতীন ব্যানার্জি নামে একজন বাঙালী যুবককে বরোদা সৈন্যবিভাগে ভরতি করে দেওয়া।

দীনেন রায় লিখছেন, "একটি দীর্ঘকায় বলবান বাঙালী যুবক একটি লোটা ও লম্বা লাঠি সম্বল করিয়া আমাদের বাসায় উপস্থিত হয় !...আগন্তুকের মুখে শুনিলাম—ইংরাজের ফৌজে বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ, এইজন্য সে ভারতের কোন করদ বা মিত্র রাজ্যের

সমর বিভাগে প্রবেশ করিবার আশায় বিদেশে বাহির হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথের সাহস, উদ্যম, উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া অরবিন্দ বিস্মিত হইলেন।...ফৌজে বাঙ্গালীর প্রবেশ নিষেধ বলিয়া যতীন্দ্রনাথ স্বীয় বাঙ্গালীত্ব গোপন করিয়া পুরুলিয়া ব্রাহ্মণ সাজিল।"

অরবিন্দ তাঁকে বরোদায় পদাতিক সৈন্যরূপে ভরতি করালেন। এক বছর শিক্ষানবিসির পরে তাঁকে তিনি বাংলাদেশে পাঠালেন বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করতে। তাঁকে একটি কর্মসূচী দিলেন : বিপ্লব আন্দোলনের জন্য লোকজন, টাকাপয়সা, উপকরণ সংগ্রহ করবেন, যুবকদের নিয়ে দল গঠন করবেন, তাদের ঘোড়ায় চড়া, নানা রকমের ব্যায়াম ইত্যাদি শেখাবেন যাতে ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তারা সৈন্য হিসাবে উপযোগী হতে পারে। যতীন ব্যানার্জি বাংলায় গিয়ে গোপনে বিপ্লববাদ প্রচার করতে লাগলেন এবং সেখানে যেসব ছোটখাট বিপ্লবী সংঘ ছিল তাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করলেন।

অরবিন্দ বিপ্লবে নামলেন। বরোদা থেকে সারা দেশে তিনি বিপ্লবীদল গড়ে তুললেন। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও অন্যান্য কাজের উপলক্ষে তাঁকে প্রায়ই ছুটি নিয়ে কলকাতায় যেতে হত। তিনি য়ুরোপে পাঠালেন এক মারাঠী যুবককে, বোমা তৈরি করা শিখবে এবং অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করবে এই উদ্দেশ্যে।

শিক্ষকতা

তোমাদের স্মরণ থাকবে, কি করে অরবিন্দ আস্তে আস্তে অফিস মহল থেকে কলেজে চলে এলেন। যিনি কবি ও সাহিত্যিক, বিদ্বান, জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত, তাঁকে কি ফাইল দস্তখৎ করার কাজ সাজে? নিজের স্বধর্মে ফিরে এসে তিনি যেন মুক্তির স্বাদ পেলেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যে, ইতিহাসে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা কি বিফল হতে পারে? ছাত্ররাও তাঁকে পেয়ে যেন ধন্য হল। কলকাতায় তাঁর ভাই মনোমোহনের কবিতা পড়ানো যেমন ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত, তেমনি অরবিন্দের পড়ানো! অথচ তাঁর ধারণা যে শিক্ষক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কেননা, ছাত্রদের জন্যে খেটেখুটে নোট তৈরি করে পড়ানো তাঁর স্বভাবে ছিল না। কিন্তু দেবী সরস্বতী যাঁর জিহ্বায়, তাঁকে সেসব গাধার খাটুনি খাটতে হবে কেন? তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মতে, তিনি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করতেন তখন পাঠ্য বিষয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে জ্ঞানের

কোন্ শিখরে তিনি উঠে যেতেন কেউ কল্পনাই করতে পারত না। তাঁর ব্যাখ্যার কাছে অন্যান্য সব ব্যাখ্যাই মনে হত ছেলেমানুষি। সবাই স্তব্ধ, মুগ্ধ হয়ে শুনত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী।
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি ॥

আর ছাত্রদের ডিবেটিং ক্লাবে যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন তো সমস্ত কলেজ ভেঙে পড়ত। ইংরেজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাষা, ভাব, শান্ত ছন্দে, কিন্তু সূক্ষ্ম হাস্যরসে সমুজ্জ্বল ; কোন নাটকীয়তা নেই। অধ্যাপক থেকে তিনি ভাইস প্রিন্সিপাল হলেন, প্রিন্সিপাল হবার মুখে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায় দেড়শ টাকা বেতনের চাকরিতে।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

এই সময় অরবিন্দের দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হল, আগের মতো অকস্মাৎ, জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্তে। ঘটনাটা এই রকম : তাঁর একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কোন্ মান্ধাতা আমলের! দীনেন রায় লিখছেন, "অরবিন্দের একখানি "ভিক্টোরিয়া' গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড়, কিন্তু চলনে গাধার দাদা! চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না। গাড়ীখানি যে কতকালের তাহা কেহই বলিতে পারিত না। অরবিন্দের সকলই বিচিত্র!"

এহেন গাড়িতে চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন বাজারের দিকে, নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায়। হঠাৎ ঘোড়াটার দুর্মতি হল ; সে ভীষণ লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। গাড়ি উল্টে দেয় আর কি! অরবিন্দের জীবন সংশয় ; তিনি সংকল্প করলেন তাঁকে রক্ষা পেতেই হবে। মুহূর্তে তিনি দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক জ্যোতির্ময় পরম দেবতা। পলকে তিনি ঘোড়াকে সংযত করে অরবিন্দকে রক্ষা করলেন। এটা ঘটল যখন তিনি যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। অভিজ্ঞতাটি তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছেন, সহজ অথচ জোরালো ভাষায়। অনুবাদে তার কিছু শোনা যাক—

আমার মাথার উর্ধ্বে দেখা গেল এক মহা শক্তিশালী শির,
অমরতার প্রশান্তি মাখা একটি আনন…
সূর্য আর বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর কেশজাল,
তাঁর হৃদয় মাঝে বিধৃত সমস্ত জগৎ ; তিনি আর আমি অভিন্ন ;

আমার সত্তায় বাস করল চিরন্তনের শান্তি,
আর বল সেই অদ্বিতীয়ের—যাঁর সারবস্তু মৃত্যুহীন।

১৯০১ সাল অরবিন্দের জীবনে উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার শুরু, বিপ্লবের আয়োজন, এবং তাঁর বিবাহ, এই তিনটি ঘটনার জন্য চিহ্নিত। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৯, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীর বয়স ১৪। সুন্দরী, শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ে। উচ্চ রাজকর্মচারী শ্রীভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা। শোনা যায়, দেখামাত্র অরবিন্দ কনে পছন্দ করলেন। কলকাতার গণ্যমান্য লোক বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু, লর্ড সিংহ তাঁদের অন্যতম। বিয়ে হয় হিন্দুমতে, অরবিন্দ বিলেতফেরত বলে প্রায়শ্চিত্তের কথা ওঠে কিন্তু তাঁর পিতার মতোই তিনিও তাতে মোটেই রাজি হলেন না। তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বললেন: আচ্ছা মাথা মুড়োলেই চলবে। তাতেও অরবিন্দের আপত্তি। অগত্যা একজন পুরোহিত কিছু দক্ষিণা নিয়ে সমাজের, শাস্ত্রের মান রক্ষা করলেন।

বারীন

বিয়ের পরে অরবিন্দ বোন সরোজিনী ও স্ত্রী মৃণালিনীকে সঙ্গে নিয়ে নৈনীতাল হয়ে বরোদায় আসেন। একদিন ভোরে তিনি দেখলেন, তাঁর ছোট ভাই বারীন, 'ভূতের মতো চেহারা' নিয়ে উপস্থিত; পরনে ময়লা ধুতি, তেমনি হাতে একটি ময়লা ক্যানভাস ব্যাগ।

অরবিন্দ বললেন, "এ কি! এই অবস্থায় কোত্থেকে? যাও এখখুনি স্নানের ঘরে।" বেচারী এণ্ট্রান্স পাস করে, দাদা মনোমোহনের বাড়িতে ছয় মাস কাটিয়ে চায়ের দোকানের ব্যবসায়ে ফেল মেরে সেজদার দরজায় হানা দিলেন। সেজদার কাছে দেওঘরে আগেই তাঁর বিপ্লব সম্বন্ধে হাতেখড়ি হয়ে গেছে। এখন দাদা তাঁকে পাকা শিষ্য করে তুলতে চাইলেন।

প্লানচেট্

এই অবসরে বারীন ভুতুড়ে বিদ্যার কিছু বই পড়ে প্লানচেট্ ও টেবিলটোকা পরীক্ষায় ঝুঁকলেন। সেজদাও তাতে উৎসাহিত হলেন। কতগুলো আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ফল মিলল। দুটো মাত্র দৃষ্টান্ত দিই: যেমন, একবার অরবিন্দের বাবার নামধারী এক 'আত্মা' (spirit) বৈঠকে এসে হাজির। বলল, 'বারীনের ছোটবেলায় আমি তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলাম।' বারীনের মনে পড়ল যে ব্যাপারটা ঠিকই।

আর একবার শ্রীরামকৃষ্ণের 'আত্মা'কে বৈঠকে ডাকা হল। তিনি বললেন, 'মন্দির গড়ো'। তখন সকলের মাথায় বিপ্লবের কথা ঘুরছে, দেশের স্বাধীনতার চিন্তা প্রবল। তাঁরা ভাবলেন, বঙ্কিমের উপন্যাস 'আনন্দমঠ'এ ভবানী মন্দিরের যে বর্ণনা আছে শ্রীরামকৃষ্ণ সেরকম মন্দির গড়বার কথা বলছেন। কিন্তু আসলে নিজেদের ভেতরে মন্দির গড়া ছিল তার অর্থ। অর্থাৎ নিজেদের অন্তরে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা কর, বাইরে নয়। অরবিন্দ তা বুঝলেন অনেক পরে।

অরবিন্দ এখন বারীনকে কলকাতায় পাঠালেন যতীন ব্যানার্জিকে বিপ্লবের কাজে সাহায্য করতে। ১৯০১-১৯০২ সালের ছুটিতে তিনি নিজে কলকাতায় গেলেন এবং যতীন ও বারীনকে নিয়ে মেদিনীপুরে গেলেন বিপ্লব সমিতি সংগঠনের জন্যে। কলকাতায় ফিরে এসে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সঙ্গে ঐ বিষয়ে তিনি আলাপ করেন এবং তাঁকে বিপ্লবীদলের শপথ বাক্য পাঠ করান। পরে, হেমচন্দ্র দাসের হাতে তরবারি ও গীতা দিয়ে তাঁকেও শপথ পাঠ করান। তারপর বরোদায় চলে আসেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে কতকগুলি বিপ্লবীদল ছিল। অরবিন্দ তাদের সঙ্গে যোগ দেন



নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ

এবং তাদের শপথ গ্রহণ করান। বাংলা আর মহারাষ্ট্র—এই দুই দলের মাঝে তিনি যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৯০২ সালে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল, নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ: পরে সেটা বন্ধুত্বে দাঁড়াল এবং দুজনে একযোগে বিপ্লবের কাজ চালাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বাংলার কর্মীদের মাঝে দলাদলি, গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আবার কলকাতায় গেলেন। পি. মিত্রের অধীনে পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি কাউন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা তৈরি করলেন; নিবেদিতাও ছিলেন একজন সদস্য। নিবেদিতার নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। বিবেকানন্দের অন্যতমা শিষ্যা; তিনি বিলেত থেকে আসেন, জীবন উৎসর্গ করেন ভারতের হিতার্থে। অসাধারণ তেজস্বিনী, বিদুষী মহিলা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, নিবেদিতার কাছে আমাদের যে ঋণ তা শোধ করা অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, কাউন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা বেশিদিন টিকল না। তবুও, পি. মিত্রের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের কাজ অসম্ভব বেড়ে যায়। হাজার হাজার যুবক দলে দলে যোগদান করে; এমন কি, সরকারী চাকুরে পর্যন্ত এই কাজে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বারীনের উদ্যোগে 'যুগান্তর' নামে একটি কাগজ বের করা হল; তাতে বিপ্লব, গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে প্রবন্ধ লেখা হত। অরবিন্দ তাতে লিখতেন। কাগজের চাহিদা এত বেড়ে যায় যে দিনে দু'তিনবার কাগজ ছাপাতে হত।

অরবিন্দকে মহারাজার ডাকে কাশ্মীর যেতে হল। সেখানে তক্ত-ই-সুলেমন (সুলেমনের সিংহাসন) পাহাড়ের উপর শঙ্করাচার্যের মন্দির। সেই পাহাড়ে যখন তিনি বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর একটা অভিজ্ঞতা হল। এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি একটি সনেট রচনা করেছেন, নাম 'অদ্বৈত'।

তোমাদের বলেছি যে একবার প্লানচেট্ বৈঠকে বারীন 'মন্দির গড়ার' নির্দেশ পান। তাঁর মাথায় তখন ঢুকল বিপ্লবীদের জন্যে একটি মন্দির গড়তে হবে, কতকটা বঙ্কিমের ভবানী মন্দিরের অনুকরণে। বারীন বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কোথাও মনোমত জায়গা পেলেন না। তার বদলে 'পাহাড়ী জ্বর' নিয়ে তিনি ফিরলেন সেজদার কাছে বরোদায়। একদিন কোথা থেকে এক ন্যাংটো নাগা সন্ন্যাসী বাড়িতে এসে হাজির। সন্ন্যাসী অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে শুয়ে আছে ওখানে?" সব ব্যাপার শুনে সন্ন্যাসী বললেন, "এক গ্লাস জল নিয়ে এস।" মন্ত্র পড়তে পড়তে একটা ছুরি দিয়ে জলের উপর দাগ কাটলেন আর বারীনকে বললেন "খাও! জ্বর ছেড়ে যাবে আগামী কাল।" ঠিক তাই হল।

কতদিনের জ্বর সেরে গেল একদিনে !

শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন :

"আমি এই প্রথম যোগশক্তির প্রমাণ পেলাম ; আর ভাবলাম, যোগে যদি এরকম শক্তি থাকে, তাকে তো দেশের কাজে ব্যবহার করা যায়। যোগের দিকে যে আমার টান হল, এটাই তার প্রত্যক্ষ কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'মন্দির গড়ো' দিল শেষ ধাক্কা। সেজন্যে আমি বলেছি যে যোগের পথে আমি প্রবেশ করেছি খিড়কি দরজা দিয়ে। কিন্তু আপাতত ভবানী মন্দির গড়বার জন্য বারীন অস্থির। আমায় বলল, মন্দিরের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন, নিয়মাবলী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তিকা লিখতে ; বিপ্লবীদের প্রেরণা দেবে।"

'ভবানী মন্দির' রচনা করলেন তিনি। অপূর্ব বই এই 'ভবানী মন্দির'। কিন্তু বইটা শুধু অমর হয়ে রইল, কাজ কিছু হল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, সকলের সেদিকে টান। তবুও বারীন সেই আদর্শের কিছুটা তাঁর মাণিকতলা বাগানে পরবর্তীকালে প্রবর্তন করেছিলেন।

'ভবানী মন্দির' বই-এর কিছু অংশ শোন : পাহাড়ের ভেতরে মা ভবানীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির গড়তে হবে। মা'র সন্তানবৃন্দ, তোমরা সকলে এস, এই পবিত্র কর্মে নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর।

মা ভবানী কে ? কেন আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে মন্দির গড়ব ?

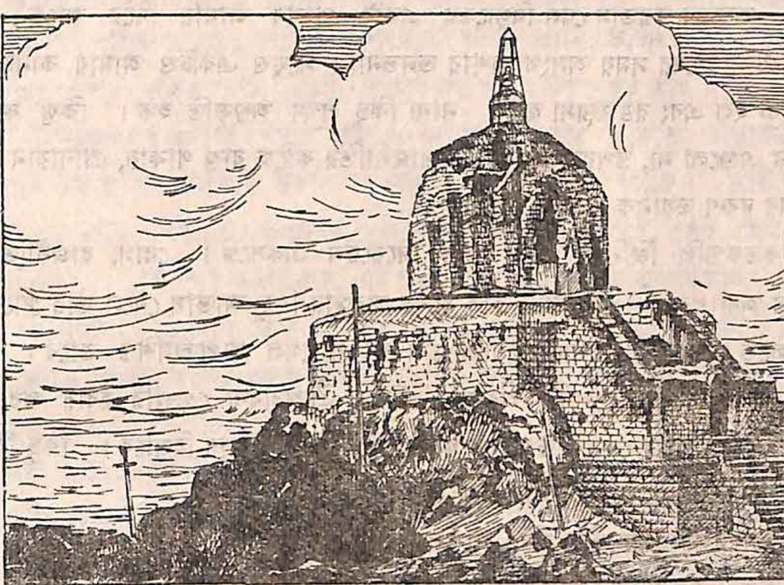
ভবানী হলেন অসীম শক্তি, তিনি আবার দুর্গা, তিনি কালী, তিনি রাধা, লক্ষ্মী, তিনি আমাদের মা এবং সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী।

বর্তমান যুগে মা আবির্ভূতা হয়েছেন বলধারিণী জননীরূপে, তিনিই শক্তি।

যোগজীবন

আমরা এখানে শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিষয় কিছু বলে রাখি। পরে সবিস্তার বলতে হবে, কারণ তিনি জন্মযোগী এবং সাধনা করে হলেন যোগেশ্বর। একজন যোগীর মতে, হিমালয়ের নীচে তাঁর মতো বড় যোগী আর নেই। অথচ গোড়ায় এদিকে তাঁর কোন আকর্ষণই ছিল না। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হল কি করে তাঁর যোগে টান হল, তিনি উত্তর দিলেন :

"ভগবান জানেন কি করে। বরোদায় আমার বন্ধুরা আমায় যোগ অভ্যাস করতে



তক্ত-ই-সুলেমন পাহাড়ের উপর শঙ্করাচার্যের মন্দির

বলল। আমি খুব উৎসুক হলাম না; কেননা আমার ধারণা যে যোগ করতে হলে পাহাড়ে পর্বতে গুহায় গিয়ে থাকতে হবে। আর আমার মন প্রাণ চায় দেশের স্বাধীনতা। যখন দেখলাম যোগশক্তি বারীনের রোগ সারাল, তখন আমার চোখ খুলল। যোগ সম্বন্ধে ভুল ধারণা ভেঙে গেল। আস্তে আস্তে সেদিকে মন ঝুঁকল এবং যখন যোগ নিতে মনস্থ করলাম, আমি এই প্রার্থনা করলাম : 'যদি তুমি থাক, তাহলে আমার মনের কথা জান। তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না; অন্যেরা যা চায়, সে বস্তু আমি চাই না; এই দেশকে তুলতে, আমার প্রিয় দেশবাসীদের সেবা করতে আমি চাই শক্তি'।"

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, যখন তিনি যোগ নিলেন, তাঁর মধ্যে যোগ ও রাজনীতিতে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। দুটোই তিনি একসঙ্গে চালালেন।

কি ভাবে? তাঁর কথায়, "প্রাণায়াম নিয়ে আমি আরম্ভ করলাম। মহাযোগী ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্য আমায় প্রথম পাঠ দিল; তার পরে, আমি নিজে অভ্যাস করতে লাগলাম। প্রায় চার বছর দিনে ৫।৬ ঘণ্টা করে অভ্যাস চলল। ফলস্বরূপ, মস্তিষ্ক আলোময় হল, যাকে বলা হয় প্রকাশময়, মনে এল দীপ্তি ও শক্তি। কবিতা লেখার শক্তি দারুণ বেড়ে গেল। আগে যেখানে লিখতাম মাসে ২০০ লাইন, তা' এখন লিখলাম আধ

ঘণ্টায়। অনুভব করতাম যেন বিদ্যুতের একটা প্রভাব আমায় ঘিরে আছে; সেজন্যে বোধহয় প্রাণায়ামের সময় অসংখ্য মশার ভনভনানি সত্ত্বেও একটিও আমায় কামড়াত না। শরীর পুষ্ট হল এবং রঙ ফরসা হল। নানা কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি হত। কিন্তু ফল আর বেশি দূর এগুলো না, উপরন্তু কলকাতায় রাজনীতির কাজে ব্যস্ত থাকায়, প্রাণায়াম অভ্যাসে অনিয়মের দরুণ ভয়ানক অসুখে পড়লাম।"

কতকগুলি জিনিসে তিনি হাত দিয়েছেন একসঙ্গে! যোগ, রাজনীতি, বিপ্লব, কলেজের অধ্যাপনা। এই সময় তাঁর মনের অবস্থার কিছু আভাস মেলে তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলিতে। অমূল্য সম্পদ এই চিঠিগুলি পাওয়া গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। বুঝতেই পারছ, এগুলি অত্যন্ত গোপনীয় অন্তরঙ্গ চিঠি। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হবার পর, পুলিস সেগুলি হস্তগত ক'রে কোর্টে উপস্থিত করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে। কিছু কিছু অংশ শোন। চিঠিগুলোতে দুটো ভাব লক্ষ্য কর;

ভগবানের জন্যে তাঁর তীব্র ব্যাকুলতা,
অপরদিকে দেশের জন্য গভীর ভালবাসা;

দুটোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

তিনটি পাগলামি

১৯০৫ সালের ৩০এ আগস্টের চিঠিতে তিনি লিখছেন:

"আমার তিনটি পাগলামি আছে: প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।

দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চাপিয়াছে। পাগলামিটা এই যে, কোনমতে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে...ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি...এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম হিন্দু ধর্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি, এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই...

তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে ; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে ? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে ?...না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায় ? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার শক্তি আমার আছে। শারীরিক বল নয়...জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

এই চিঠিতেই তিনি লেখেন :

"এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার তিরিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে...তাহাদের হিত করিতে হয়। —এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা।"...

এই চিঠিগুলিতে শ্রীঅরবিন্দের তখনকার মনের গভীর চিন্তা ও ভাবগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃণালিনী দেবী শ্রীঅরবিন্দকে বোধহয় সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি কিন্তু শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, মোক্ষ। ১৯১৮ সালে পণ্ডিচেরী আসার পথে কলকাতায় সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

যোগী ব্রহ্মানন্দ

১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ বন্ধুদের সঙ্গে যোগী ব্রহ্মানন্দকে দেখতে যান। তিনি থাকতেন নর্মদা নদীর তীরে চান্দোদে, গঙ্গামঠে। মস্ত যোগী, প্রায় ৩০০ বছর নাকি বেঁচেছিলেন। লোকজন তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি সাধারণত চোখ বুঁজে আশীর্বাদ করতেন। শ্রীঅরবিন্দের বন্ধুরা তাঁকে একে একে প্রণাম করলেন, তাঁর নিমীলিত চোখ। কিন্তু যেই শ্রীঅরবিন্দ এলেন, ব্রহ্মানন্দ তাঁর অপূর্ব চোখ দুটি পুরোপুরি খুলে তাঁর দিকে তাকালেন, যেন অসাধারণ কিছু বা আপন জন কেউ এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, তিনি যেন আমার সমস্ত ভিতরটা দেখে নিলেন।

চান্দোদে তাঁর একটি অভিজ্ঞতা হয়। সে সম্বন্ধে একটি সনেটও লিখেছেন, নাম প্রস্তর দেবী বা Stone-Goddess. শ্রীঅরবিন্দ দেবদেবীতে বা মূর্তি পূজায় আদৌ বিশ্বাস করতেন না। নর্মদার তীরে অনেক মন্দির আছে। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একটি কালীমন্দিরে ঢুকে পড়েন; নেহাৎ কৌতূহলবশতঃ নিশ্চয়। কালীমূর্তির দিকে তাকাতেই দেখলেন মূর্তির দুটি জীবন্ত চোখ। মা কালীর দর্শন লাভ করলেন। তখন যিনি বুঝলেন যে মূর্তি শুধু মাটির ঢেলা নয়, মৃন্ময়ী চিন্ময়ীও বটে। সনেটের দুচারটা লাইন অনুবাদে শোন ঃ

দেবতাবৃন্দের শহরে, একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের মাঝে
প্রতিমার দেহ থেকে আমার দিকে তাকালেন পরমেশ্বরী—
মৃত্যুহীন এবং দিব্যশোভা, এক জীবন্ত উপস্থিতি,
একটি রূপ যা সমগ্র অসীমকে দিয়েছে আশ্রয়।

পরে একটা চিঠিতে এই অভিজ্ঞতাকে ঘুরিয়ে লেখেন তিনি :

"নির্মল নদীতীরে কালীমন্দিরের সামনে তুমি দাঁড়ালে আর দেখলে। কি দেখলে? মনোরম স্থাপত্যকলা বা একটা শিল্পমূর্তি? হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। কোথায় মূর্তি? তার বদলে দেখলে অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় একটি মুখ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; অনুভব করলে একটি শক্তি, একটি আবির্ভাব। তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল, পেলে বিশ্বজননীর দর্শন।"

এইভাবে নানা আকস্মিক অভিজ্ঞতার আস্বাদ দিয়ে ভগবান যেন শ্রীঅরবিন্দকে যোগের পথে টেনে নিলেন; কিন্তু কর্ম ত্যাগ করে নয়, পরন্তু কর্মের ভেতর দিয়ে; কর্ম এবং যোগ একসঙ্গে মিলে, বলতে পার কর্মযোগ।

সপ্তম অধ্যায়

রাজনীতি ঃ জাতীয় আন্দোলন

তোমাদের বলেছি, শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কাজের তিনটি ধারা: বিপ্লব, জাতীয় আন্দোলন, জনসংগঠন। বিপ্লবের পরে অন্য ছুটি তিনি শুরু করলেন।

এখন আমরা একটু পেছন দিকে তাকাই। স্মরণ কর ১৯০০ সালের কথা, যখন শ্রীঅরবিন্দ যতীন ব্যানার্জিকে পাঠালেন বাংলাদেশে। পরে, তিনি স্বয়ং চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে প্রায়ই কলকাতায় আসতেন বিপ্লবীদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে। তিনি বহুদিন ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন যাতে পাকাপাকি চলে আসতে পারেন।

এমন সময় শুরু হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অন্য নাম স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৫ সালে। সরকার সমস্ত জনমতের বিরুদ্ধে বাংলাকে দুভাগ করেছে বাংলার শক্তিকে খণ্ড ও দুর্বল করার জন্যে। সারা দেশে বিপুল উত্তেজনা, দেশময় সভাসমিতি, একমাত্র উদ্দেশ্য এই বঙ্গভঙ্গ রদ করতেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লবীদলকে বললেন, "এই আমাদের স্বর্ণ মুহূর্ত। এই তীব্র অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দাও। তাদের বিপ্লবীদলে ভরতি কর।"

হঠাৎ কার কণ্ঠ গেয়ে উঠল,

বন্দেমাতরম্!

ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্র নৈঃশব্দ্য থেকে জেগে উঠল; আকাশ বাতাস নদনদী মুখরিত করে বৃদ্ধ তরুণ নরনারীর সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল,

বন্দেমাতরম্!

যদি কোন দেশ শতবছরের ঘুম থেকে রাতারাতি জেগে উঠেছে শুনে থাক, জেনো, সে হল বাংলাদেশ আর বন্দেমাতরম্ সেই জাগরণের মন্ত্রশক্তি।

তেমনি রুখে উঠল সরকার। এই আন্দোলন দমন করতেই হবে। সভাসমিতি বেআইনি হল, অবাধে নিরস্ত্র লোকের উপর পুলিসের লাঠি-পেটা চলল। "বন্দেমাতরম্ ডাক নিষিদ্ধ, বন্ধ কর সে ডাক"—পুলিসের হুকুম।

১৯০৬ সালে বরিশালে এমনি একটি সভায় শ্রীঅরবিন্দ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। এই প্রথম প্রকাশ্য রাজনীতিতে তিনি যোগ দিলেন। পুলিস সভা



কোন এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

জোর করে ভেঙে দিল, স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঠি চালাল। একটি ছেলের মাথায় পড়ল লাঠি, রক্ত ঝরল, তবু সে বন্দেমাতরম্ ডাক থামাল না।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একেবারে সামনে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তিনি পূর্ব বাংলা পরিক্রমায় বের হলেন এবং কংগ্রেসের গরমপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই সময় তিনি জাতীয় দলের সৃষ্টি করেন।

যখন ১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কলেজ খোলা হল, তাঁকে নিযুক্ত করা হল অধ্যক্ষের (Principal) পদে। তিনি বরোদা কলেজের ৭৫০ টাকা বেতনের উপাধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিয়ে ১৫০ টাকা বেতনের এই পদ গ্রহণ করলেন। রাজা সুবোধ মল্লিক শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবকর্মের সহকর্মী ; এক লাখ টাকা দান করেন জাতীয় কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই কারণে তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে রাজা উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি শর্ত করেন যে শ্রীঅরবিন্দকে অধ্যাপক নিযুক্ত করতে হবে। সুবোধ মল্লিক তাঁর সহকর্মী ও বিশেষ বন্ধু। কলকাতায় এলে শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই তাঁর বিরাট বাড়িতে থাকতেন।

শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীনের 'যুগান্তর' কাগজের কথা উল্লেখ করেছি। বলেছি, তিনি এতে নিজে লিখতেন। কাগজটি এমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অবিলম্বে সরকারের

বিষনজরে পড়ে যায়। সহকারী সম্পাদক, বিবেকানন্দের ভাই, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীঅরবিন্দের আদেশে তিনি ব্রিটিশ আদালতের বিচার অস্বীকার করেন ; ফলে তাঁর জেল হয়। ব্রিটিশ আদালত অমান্য করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। এতে কাগজের মান ও প্রভাব দারুণ বেড়ে গেল।

'বন্দেমাতরম্'

এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্' কাগজ বের করলেন। বাগ্মী, রাজনীতিবিদ, সাধক, পণ্ডিত, দেশনেতা হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ডাকলেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। শ্রীঅরবিন্দ তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন ; এই সুযোগের জন্যই তিনি এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর মনে হল, এতে তাঁর বিপ্লব প্রচারের সুবিধা হবে ; তাঁর মতামত তিনি স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন। তাঁর প্রথম কাজ হল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা। নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই দাবি দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন। দেশ সেই দাবি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল। কাগজে তাঁর বিরাট কর্মতালিকা প্রকাশ করলেন যা দেশের লোক কল্পনাই করতে পারেনি। সেই কর্মতালিকাকে কাজে লাগাতে হলে মডারেট বা নরমপন্থী নেতাদের হাত থেকে কংগ্রেসকে দখল করতে হবে, এবং তাদের ভিক্ষাবৃত্তি, ভীরু আবেদন-নিবেদন নীতির বদলে বলিষ্ঠ, স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল নীতি অবলম্বন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করলেন একটি গরমপন্থী জাতীয় দল ; মহারাষ্ট্রের তিলককে করলেন তার নেতা। অধিকন্তু, তাঁর অন্য উদ্দেশ্য হল, জাতীয় দলের প্রভাবে দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা ; নইলে বিপ্লব আন্দোলনে কৃতকার্য হওয়া কঠিন।

তাঁর কর্মধারা হল :

(১) অসহযোগ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাতে বিদেশী শাসন অচল হয়ে পড়ে ;

(২) ব্রিটিশ আদালত, স্কুল কলেজ বয়কট ;

(৩) জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প গঠন, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার ইত্যাদি ;

(৪) শেষে, প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বিদ্রোহ।

অন্যদিকে ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে মডারেট পার্টির ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। এই দলের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখাতে হবে, এই বিদেশী শাসন কেমন

করে আমাদের সমস্ত উন্নতি ব্যর্থ করেছে, ধ্বংস করেছে আমাদের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দিয়েছে গোলামি শিক্ষা যার ফলে আমরা ইংরেজের দাস ছাড়া আর কিছুই নই। শ্রীঅরবিন্দের এই কর্মধারাই পরে মহাত্মা গান্ধী প্রায় হুবহু গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, বিদেশী শাসন যত ভালই হোক স্বাধীনতা তার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেয়।

এই সমস্ত অগ্নিবাণী দিনের পর দিন শ্রীঅরবিন্দের কলম থেকে বের হতে লাগল। তিনি 'বন্দেমাতরম্' এর সম্পাদক হলেন। কাগজের প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বন্দেমাতরম্' এর জন্যে অধীর অপেক্ষায় থাকত। বিলাতের কাগজে পর্যন্ত তাঁর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা চলত। এক বিখ্যাত ইংরেজ সম্পাদক বলত যে 'বন্দেমাতরম্' এর লেখাগুলি বিদ্রোহমূলক ভাবে ভরতি কিন্তু এমন কৌশলে লেখা যে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের কোন মামলা আনা যেত না। সম্পাদকের নামও থাকত না কাগজে যদিও সবাই জানত যে লেখাগুলি অরবিন্দ ঘোষের।

সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্'ই বোধহয় একমাত্র কাগজ যা দেশকে রাতারাতি জাগিয়ে তুলল, দেশবাসীর চিন্তাধারা বদলে দিল এবং বিপ্লবের জন্যে দেশকে তৈরি করে তুলল। কোথায় ভেসে গেল পুরোনো ভীরুতা, আলস্য, হতাশা 'বন্দেমাতরম্' এর মন্ত্রশক্তিতে! সামান্য দোকানদার পর্যন্ত বিপ্লবীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সেই যে শক্তি জাগল, সেই শক্তিই নানা ওঠানামার ভেতর দিয়ে দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লব আন্দোলন এমন ভয়ানকভাবে বেড়ে উঠেছিল যে অন্য কোন দেশ হলে ফরাসী বিদ্রোহের মতো আগুন জ্বলে উঠত।

সরকার আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রমাণ থাক বা না থাক, 'বন্দেমাতরম্' এর সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দকে পুলিস গ্রেপ্তার করল। দেশে প্রবল উত্তেজনা ও আন্দোলনের সৃষ্টি হল। শাস্তি সুনিশ্চিত জেনে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

সরকার বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হতে পরোয়ানা জারি করল। বিপিন পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁর ছ'মাস জেল হল কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন, কেননা তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, "আপনি আমাদের খুব ফাঁকি দিলেন।" শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে

বললেন, "বেশি দিন নয়।" দুবছর পরে ১৯০৮ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হলেন এবং এক বছর রইলেন জেলে। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎবাণী ফল্‌ল।

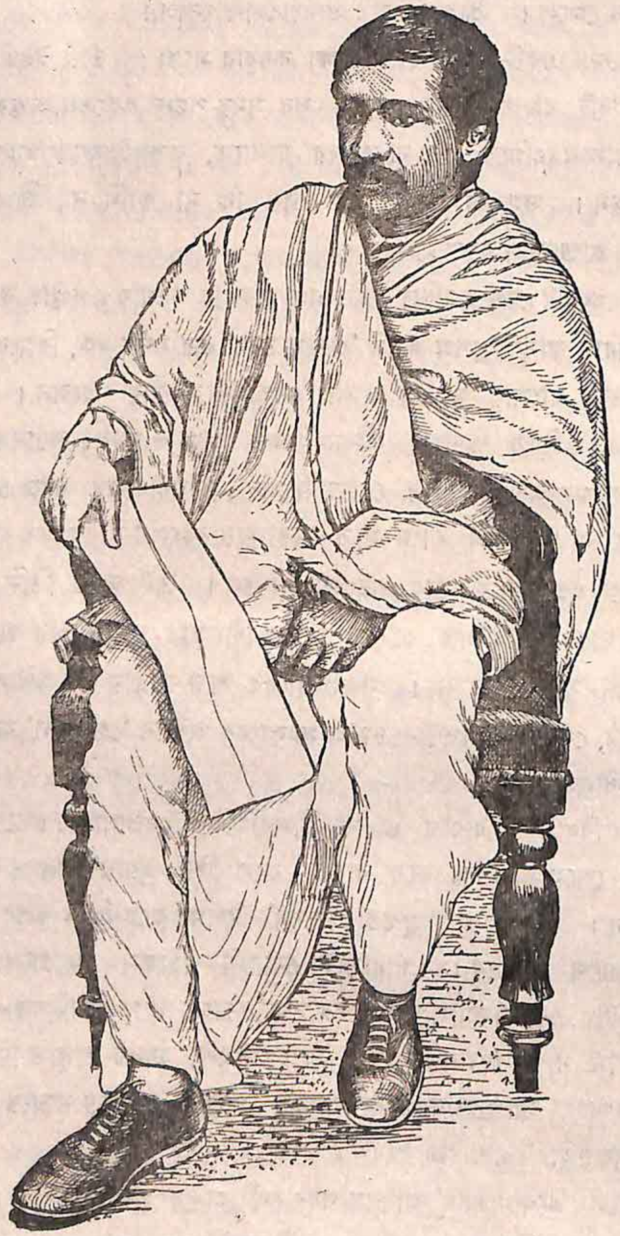
শ্রীঅরবিন্দের একটি অদ্ভুত স্বভাব লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর ইহজীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই স্বভাবটি বজায় ছিল। তিনি সব সময় পছন্দ করতেন অন্তরালে বা পিছনে থেকে অন্যদের সামনে এগিয়ে দিতে বা তাদের চালাতে, কতকটা স্বয়ং ভগবান যেমন তাঁর সৃষ্টিকে চালাচ্ছেন। ভগবান এতে মজা পান কি না জানি না, শ্রীঅরবিন্দ বোধহয় পেতেন। তিনি হাস্যচ্ছলে বলেছিলেন :

"আমার খেলাটা বেশ জমছিল ; হতভাগা সরকার আমায় গ্রেপ্তার করে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। সবাই জানতে পেল আমি 'বন্দেমাতরম্' এর সম্পাদক, বিপ্লবের মাথা।"

এখন তিনি বাংলায় জাতীয় দলের নেতা বলে স্বীকৃত হলেন। অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীঅরবিন্দের কাজ ও দায়িত্ব ভয়ানক বেড়ে গেল। তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দিলেন ; বিপ্লবীদলের কাজ চালানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি নামে মাত্র নেতা হয়ে রইলেন। কার্যত বারীনই নেতা। অবশ্য বারীন গুরুতর বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। এই সময় তিনি বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে সভাসমিতি করেন, পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন ও জাতীয় দলকে শক্তিশালী করে তোলেন। নরমপন্থীদের সঙ্গে জাতীয় দল অর্থাৎ গরমপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে, কেননা নরমপন্থীরা চাইল সরকারের অধীনে 'হোমরুল' বা স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।

এই সকল বিরাট কর্মযজ্ঞের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা চলতে থাকে, কিন্তু অনিয়মিতভাবে ; শেষে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে তিন মাস রোগ ভোগ করেন। শারীরিক অসুস্থতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করলেন। দাদাভাই নৌরজী ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টায় এবং প্রভাবে, কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা—এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি বিষয়েও প্রস্তাব পাস হয়। গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় মডারেট বা নরমপন্থী নেতারা এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করেন।

১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' অফিসে খবর পৌঁছল যে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়কে ইংরাজ সরকার নির্বাসনে পাঠাবে। শ্রীঅরবিন্দকে সেই রাত্রে ঘুম থেকে তুলে



'বন্দেমাতরম্' এর সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ

ঐ খবর জানান হল। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখলেন, "বক্তৃতার ও ভাল কথার দিন ফুরিয়ে গেছে। পাঞ্জাবের বীর! সিংহের জাত! যারা তোমাদের ধুলোয় মেশাতে চায় তাদের দেখিয়ে দাও যে এক লাজপতের পরিবর্তে শত লাজপৎ তার জায়গায় উঠে দাঁড়াবে।" এই লেখা পরদিন 'বন্দেমাতরম্' কাগজে প্রকাশিত হতেই দেশ উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। এমনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হত শ্রীঅরবিন্দের লেখায়। পুলিস 'বন্দেমাতরম্' অফিসে খানাতল্লাসি চালাল।

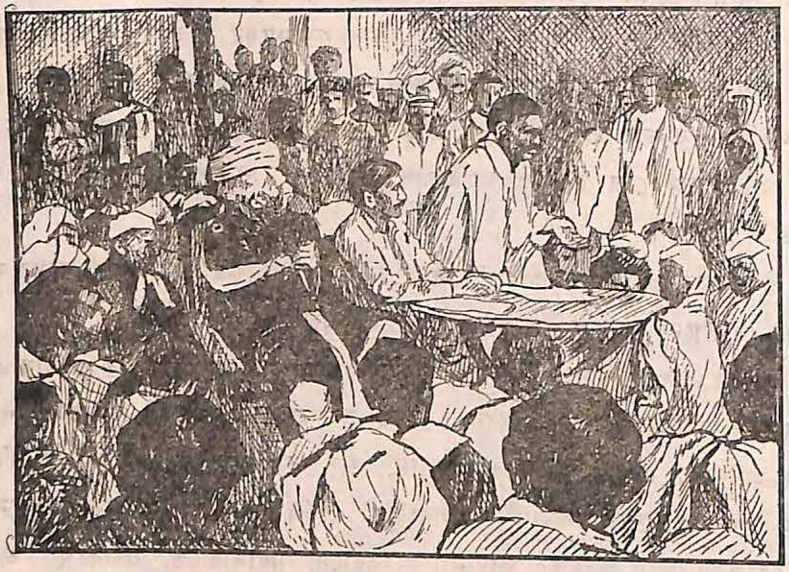
ঐ বছরের ৮ই জুন সরকার 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' এর সম্পাদকদের সাবধান করে দিল যে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় দলের প্রচার কাজে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে ঘুরতে ঘুরতে খুলনায় এলেন। সেখানে লাভ করলেন রাজকীয় সম্বর্ধনা ; তিনি যেন রাজপুত্র। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খুলনায় আমি যে এত আদর যত্ন পেলাম, তার কারণ আমি দেশের নেতা ব'লে নয়, কে. ডি. ঘোষের ছেলে বলে।" খুলনাবাসী এমন কেউ ছিল না যারা কৃষ্ণধনের কাছ থেকে কোন-না-কোন সাহায্য পায়নি। "রোগে, মহামারীতে, জলকষ্টে, অন্নাভাবে সর্বত্রই ডাঃ ঘোষের প্রসারিত হস্ত সকল কষ্টের লাঘব করেছে এক সময়। তাঁরই পুত্র ভারতের জাতীয় নেতা, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জ্ঞানতপস্বী অরবিন্দ তাদের গর্বের বস্তু—তাঁর সকল কাজে পূর্ণ সহায়তা করলেন জেলাবাসী সকলেই, গড়ে তুললেন দৃঢ় সংগঠন।"

সুরাট কংগ্রেস

প্রসিদ্ধ অধিবেশন। মডারেট বা নরমপন্থী ও জাতীয় দল বা গরমপন্থী দুই দল তাদের দলবল নিয়ে সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত। গরমপন্থী বা জাতীয় দলের নেতা তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ। দুই দলেরই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। মডারেটরা চায় ইংরেজের সঙ্গে আপস, অন্য পক্ষ চায় পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজ। শুধু তাই নয়, আগের অধিবেশনে দু'পক্ষ মিলে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এখন নরমপন্থীরা চাইল সেগুলি নাকচ করতে।

প্রথম থেকেই তারা ছিল কুমতলবী। সুরাটে তারা অধিবেশন করল এই ভেবে যে সেখানে তাদের দল ভারী, সেটা তাদের শক্তি কেন্দ্র, কাজেই ভোটে তারা জিতবে। মতের মিল যখন হল না, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দলকে বললেন, সভা ভেঙে দাও। চারিদিকে জুতো, চেয়ার ছুটল, হাতাহাতি শুরু হল। সে এক লঙ্কাকাণ্ড। অধিবেশন ভেঙে গেল।



সুরাটে গরমপন্থীদের সভায় শ্রীঅরবিন্দ সভাপতি, বক্তৃতারত তিলক

পরমুহূর্তেই গরমপন্থীদের এক সভা বসল। শ্রীঅরবিন্দ সভাপতি। তিলক ও লাজপৎ রায় সেই সভায় বক্তৃতা দেন। বলা যায়, এখানেই নরমপন্থীদের সমাধিলাভ হল। শ্রীঅরবিন্দের জনপ্রিয়তা এবার অসম্ভব বেড়ে গেল, তিনি ভারতের নেতা হিসাবে গণ্য হলেন।

অষ্টম অধ্যায়
নির্বাণ উপলব্ধি

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কাজ যত বাড়তে লাগল, তাঁর প্রাণায়াম ইত্যাদি নানা যোগ-প্রক্রিয়ায় ততই ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। সেগুলি তিনি নিয়মমত অভ্যাস করতে পারতেন না। যোগের অবস্থারও কোন উন্নতি লক্ষ্য করলেন না। তখন সুরাটে তিনি বারীনকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে যোগে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে বারীন জানেন কি না। বারীন যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের কথা শুনেছেন, তাঁকে গোয়ালিয়রে টেলিগ্রাম করলেন বরোদায় আসতে। টেলিগ্রাম পেয়েই লেলের অনুভূতি হল যে এক মহাত্মার যোগ-সাধনায় তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। তিনি সত্বর রওনা হলেন বরোদায়।

শ্রীঅরবিন্দও সুরাট থেকে বরোদায় উপস্থিত হলেন। সেই বরোদা যেখানে তিনি প্রায় তের-চৌদ্দ বছর ছিলেন, যেখানে তাঁর নির্জন জ্ঞান-তপস্যা, কর্ম-তপস্যা, যোগ-সাধনার আরম্ভ। এখন তিনি সেখানে এলেন গৌরবমণ্ডিত নেতা হিসাবে। রাজনৈতিক মহলে, ছাত্র মহলে কী চাঞ্চল্য! সর্বত্র প্রবল সাড়া, যেন তাদেরই পরম আত্মীয় যুদ্ধ জয় করে ফিরেছেন। সকলেই ভিড় করে তাঁকে দেখতে এল।

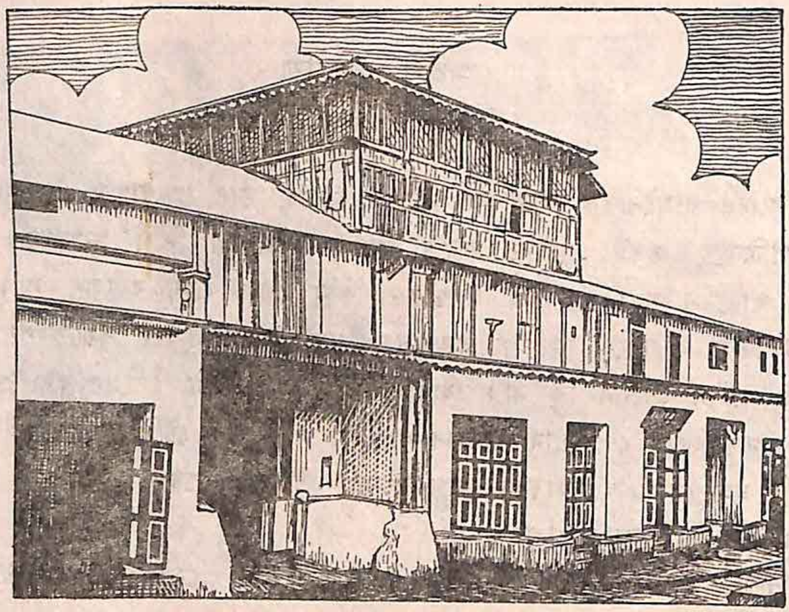
লেলের ইচ্ছা, শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক কাজ ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে যোগের পথ অবলম্বন করুন। শ্রীঅরবিন্দ তাতে রাজি হলেন না, তবে কিছুকাল রাজনৈতিক কাজ স্থগিত রাখতে সম্মত হলেন।

একদিন হঠাৎ তিনি সেই উত্তেজনার মত্ত কোলাহল থেকে উধাও হলেন। কেবল অন্তরঙ্গদের জানিয়ে গেলেন তাঁর ঠিকানা ও উদ্দেশ্য। তিনদিন ধরে লেলের সঙ্গে একটা ছোট ঘরে তিনি আবদ্ধ হয়ে রইলেন। সেই সময় যা ঘটল, আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তার জুড়ি নেই।

লেলে তাঁকে বললেন, "চুপ করে বসুন। লক্ষ্য করবেন যে আপনার চিন্তাগুলি বাইরে থেকে আসছে। আপনার ভেতরে প্রবেশ করবার আগেই তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।"

যা বলা, তাই করা।

শ্রীঅরবিন্দ কি করলেন তা তাঁর নিজের ভাষায় শোন :



শ্রীঅরবিন্দ লেলের সঙ্গে বরোদায় যে বাড়িতে ধ্যানে বসেন

"আমি পূর্বে কখনো শুনিনি যে চিন্তাগুলি দেখা যায় অথবা সেগুলি বাইরে থেকে আসে ; কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় স্তব্ধ হওয়ার মতো আমার মন এক মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম চিন্তাগুলি একটার পর একটা বাইরে থেকে আসছে ; তারা ভেতরে প্রবেশ করবার আগেই আমি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তিনদিনের মধ্যেই আমি চিন্তামুক্ত। আমার মন ভরে উঠল এক শাশ্বত নীরবতায়। সেই নীরবতা এখনও রয়েছে।"

তিনি বলেছেন : "তারপরে নানা প্রবল শক্তিশালী অভিজ্ঞতা ঘটতে লাগল। দেখলাম, এই জগৎটা যেন সিনেমার পর্দার উপর কতকগুলি ছায়াছবি মাত্র ; আর তাদের ধরে রয়েছে বিশ্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক পরম ব্রহ্ম। কল্পনাতীত গাঢ় এই অনুভূতি নিয়ে এল অবর্ণনীয় শান্তি, বিশাল নীরবতা, অসীম মুক্তি ও স্বাধীনতা।"

একেই বলে নির্বাণের উপলব্ধি। লেলে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ এই ধরনের অভিজ্ঞতা তিনি নিজেও আশা করেননি।

মনের এই অপরিসীম নীরবতা নিয়ে তিনি ফিরে এলেন জনতার মধ্যে।

গেলেন বম্বে শহরে ; সেখানে এক বন্ধুর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি শহরের দিকে তাকালেন। শহরের চঞ্চল ব্যস্ততা, অফুরন্ত চলাফেরা, বিচিত্র কাজকর্ম দেখে তাঁর মনে হল যেন সিনেমার ছবি দেখে যাচ্ছেন তিনি ; অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী ছায়াবাজির খেলা।

তাঁর 'নির্বাণ' সনেটে মনের এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা পাই। অনুবাদে কিছু শোন :

"এ নগরী এক শিথিল অলীক ছায়াছবি,
ভাসমান, কম্পমান ; বৈচিত্র্যহীন রূপ, রেখা
ভেসে চলেছে, সিনেমার শূন্য চিত্রের মতো…"

নীরবতার বাণী

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এল। মনের এই অবস্থায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে বম্বের কোন সমিতিতে। কিন্তু মন যে একেবারে নীরব। কোন কথাই আসছে না। অথচ তিনি 'না'ও বলতে পারছেন না, তিনি যে লোক-নেতা। তখন লেলে বললেন, "কোন ভয় নেই ; আপনি মনে মনে শুধু প্রার্থনা করবেন।"

শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন, "প্রার্থনা করব কি করে ? মনের এই নীরবতায় প্রার্থনার কোন ভাবই যে আসে না।"

লেলে তখন বললেন যে তিনি এবং তাঁর অন্য বন্ধুরা তাঁর জন্যে প্রার্থনা করবেন, তাঁকে কিছুই করতে হবে না। তিনি শুধু সভায় গিয়ে দাঁড়াবেন ; শ্রোতাদের নারায়ণ ভেবে নমস্কার করবেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে অন্য কেউ কথা বলবে।

শ্রীঅরবিন্দ ঠিক তাই করলেন। দেখলেন যে তিনি নিজে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আর তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বের হচ্ছে। সে কী মর্মস্পর্শী ও জোরালো বক্তৃতা ! তার সামান্য অংশ শোন :

"নিজেদের মাঝে শক্তির সন্ধান কর, তাকে সামনে নিয়ে এস। তাহলে যা কিছু তোমরা কর না কেন, বুঝবে যে তোমরা তা করছ না, করছে তোমাদের মধ্যে সেই শক্তি।…তোমাদের মধ্যে রয়েছে সেই অজর, অমর, অজাত, শাশ্বত, যাকে তরবারি বিদ্ধ করতে পারে না, আগুন দগ্ধ করতে পারে না ; পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যার কাছে তুচ্ছ।"

বম্বে থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হল, সমস্তই এই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে। যখন তিনি কলকাতায় ফিরছেন, লেলের কাছে তাঁর সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ চাইলেন। লেলে যখন শুনলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর

অন্তর থেকে বাণী শুনতে পান, তিনি বললেন যে তাহলে আর কোন উপদেশের প্রয়োজন নেই। তাঁর অন্তর-গুরুই তাঁকে পরিচালিত করবেন।

মনের এই পূর্ণ নীরবতা শ্রীঅরবিন্দ কখনো হারাননি। এর পর থেকে তাঁর সমস্ত বক্তৃতা, 'বন্দেমাতরম্', 'ধর্ম্ম', 'কর্মযোগিন্', 'আর্য্য' পত্রিকায় লেখা, বহুবিধ চিঠিপত্র ইত্যাদি এই নীরব, নির্বিকল্প মনের দান। তুমি যন্ত্র হিসাবে লিখে যাও : তোমার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। "মস্ত বড় স্বস্তি ও শান্তির অবস্থা," তিনি বলেছেন। এই অভিজ্ঞতা হলে তবে অহং ভাব থেকে মুক্তি আসে, ভগবৎ শক্তির যন্ত্র হিসাবে কাজ চলে, তখন যোগ হয় কর্মসু কৌশলম্—সুষ্ঠুভাবে কাজ করার কৌশল।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেখ। লেলে যখন পরে কলকাতায় এলেন এবং শুনলেন যে শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান-ধারণা সব ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তিনি ভয় পেলেন। ভাবলেন শ্রীঅরবিন্দ বিপথে চলে গেছেন। বললেন যে তাঁকে শয়তানে পেয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ শুধু চুপ করে শুনলেন। তখন তাঁর কাজে কর্মে, অবসরে ঘুমে, সব সময়ই ধ্যান চলছে। কাজেই নিয়মমত ধ্যানের কোন প্রয়োজন আছে কি ? 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, সন্ধ্যাপূজা সে কি চায় ?'

তাহলে দেখ, শ্রীঅরবিন্দ কেমন আধার ! লেলের মতো যোগীও তাঁর সম্বন্ধে ভুল করে বসলেন। তোমাদের বলেছি, যদিও লেলের সাহায্যে শ্রীঅরবিন্দের নির্বাণের অভিজ্ঞতা হল, সেটা কিন্তু লেলে মোটেই আশা করেননি, কারণ তিনি চেয়েছিলেন ভক্তিমূলক কোন অভিজ্ঞতা। লেলে এখন শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। এখন থেকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা চলল তাঁর অন্তর-গুরুর নির্দেশে।

এই সময়ে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন যুবকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের দেখা হয়। তিনি পরে একজন বিপ্লবী নেতা হন। স্বদেশীর কাজে তিনি প্রচুর টাকা-পয়সা দান করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে কি ভাবে দীক্ষা দিলেন শোন। তিনি অমরনাথকে বললেন, "যদি আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই তাহলে আমাদের সর্বস্ব দিতে হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে, পৃথিবীর মানুষ স্বাধীন হবে না। ভগবানের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দাও আর মায়ের নাম নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। এই হল আমার দীক্ষা।"

অমরনাথ পরে বলেন, "এই দীক্ষা আমার সমস্ত জীবন গড়ে তুলল ; চলে গেল সব ভয় আর আসক্তি।" শ্রীঅরবিন্দের, দুচারটে কথা মানুষের কী পরিবর্তন সাধন করতে পারে দেখ। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। অমরনাথের নাম মনে রেখ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের এক সংকটমুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

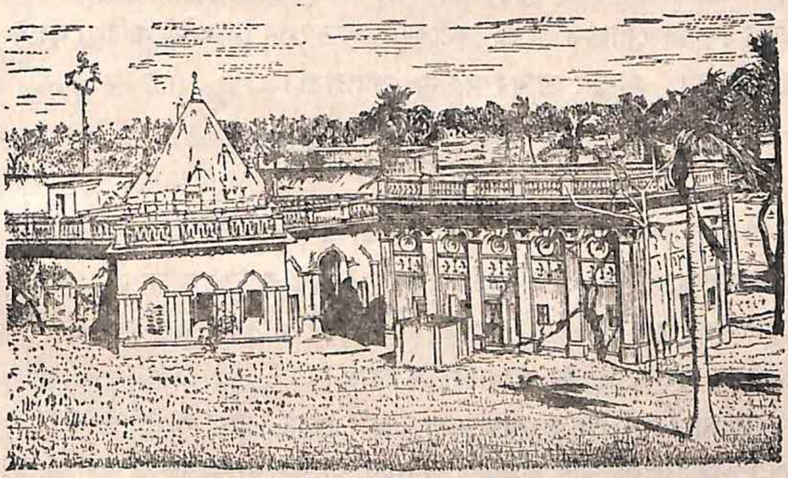
আলিপুর আশ্রমবাসী

১৯০৮ সাল

৩০শে এপ্রিল মুজঃফরপুরে বোমা ফাটল। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী, দুই বিপ্লবী তরুণ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুলে মারল দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে। কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় কিংসফোর্ড রাজনৈতিক আসামী তরুণ ছেলেদের ভয়ানক শাস্তি দিত। একটি ছেলেকে বেত দিয়ে মারবার হুকুম দিল। ছেলেটি বেত্রাঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল আর সাহেবটি সেই নিদারুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখল। সেজন্যে বিপ্লবীরা তাকে মারবার ব্যবস্থা করে।

এই খবর টেলিগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের কাছে এল; তিনি তখন 'বন্দেমাতরম্' অফিসে; তিনি অবশ্য এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বারীনের কাছে মাণিকতলা বাগানে খবর পাঠালেন যেন সেখানকার বিপ্লবীরা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলে। তিনি চলে গেলেন নিজের বাড়িতে।

১লা মে পুলিসের জালে মাণিকতলার বাগানবাড়িতে বিপ্লবীরা ধরা পড়ল।



মাণিকতলার বাগানবাড়ি

২রা মে। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন। ভোরবেলায় ইংরেজ ও দেশী পুলিস তাঁর বাড়ি ঘেরাও করল। পুলিস রিভলবার হাতে উঠে এল দোতলায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপূর্ব হাস্যরসের বই 'কারাকাহিনী'তে এ সম্বন্ধে লিখছেন :

"...আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম।...শুনিলাম, একটী শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে... ক্রেগান (সাহেব) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অরবিন্দ ঘোষ কে ?'...আমি বলিলাম, 'আমিই অরবিন্দ ঘোষ।' অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন।"

শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের খবর বোমার আওয়াজের মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ। কেউ বিশ্বাস করতে পারল না যে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবীদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত। ঘোরতর ধরপাকড় শুরু হল : পুলিস বিরাট জাল পেতে বাংলার বহু বিপ্লবীদের পাকড়াও করল। প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে নিজের প্রাণ নিয়ে গ্রেপ্তারের হাত এড়াল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। সরকারের আনন্দের সীমা নেই যে অরবিন্দ ঘোষকে তারা গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। অরবিন্দই তো সব নষ্টের গোড়া ! তাঁকে লালবাজার থানায়, পরে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

বিচার আরম্ভ হল ১৮ই মে এবং পুরো এক বছর ধরে চলল। ৪২ জন আসামী, ৪০০০ দলিলপত্র, ৩০০-৪০০ অন্যান্য প্রমাণ, ২২২ জন সাক্ষী ! এরকম বিচার বোধহয় পৃথিবীতে এই প্রথম। মামলার খরচ চালাতে অর্থ-সাহায্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দের বোন সরোজিনী দেশের লোকের কাছে আবেদন জানালেন। ধনী, গরিব সবাই যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাল। জানাল তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা।

জেলের অভিজ্ঞতা

শ্রীঅরবিন্দের মতো বিদ্বান, মহৎ চরিত্র ও উচ্চ বংশজাত সর্বজনমান্য নেতাকে যেভাবে জেলে রাখা হয়, তাতে বোঝা যায় যে ইংরেজ জাতির কাছে দাস ছাড়া আমাদের আর কোন মূল্য ছিল না।

শোন এই অমানুষিক ব্যবহারের ইতিহাস :

প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে রাখা হল একটি ছোট্ট 'সেল'-এ, ন' ফুট আর ছ' ফুট তার আয়তন। সেই একটি মাত্র কুঠুরিতে শোওয়া, খাওরা, মলমূত্র ত্যাগ করা। কারও সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ। মানুষ এই অবস্থায় একদিনে পাগল হয়ে যায়। পরে তাঁকে

একটি বড় হলঘরে, অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্রে রাখা হল। তিনি একটি কোণে পড়ে থাকতেন। কিন্তু এই সামান্য সুখ-সুবিধাটুকু বেশিদিন টিকল না। জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই বিপ্লবীদের হাতে খুন হবার পর আবার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা 'সেল' এ পুরে দেওয়া হল। কেবল আদালতে বিচারের সময় ও দৈনিক বিহারের সময় তাঁরা একত্র হতেন, কিন্তু কোন কথাবার্তা চলত না।

শ্রীঅরবিন্দ হলঘরে বা পরে একলা থাকবার সময় সর্বক্ষণ ধ্যানে ও গীতা, উপনিষদ পাঠে মগ্ন থাকতেন। ছেলেদের হাসি, গোলমাল, খেলাধুলা কিছুই তাঁর সাধনার ক্ষতি করত না। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়া ভাষণে আমরা তাঁর জেলে থাকার সময়ের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাই। তিনি বলেন :

"আমি যখন ধৃত হই···কিছুক্ষণের জন্য আমার বিশ্বাস টলেছিল, কারণ ভগবানের ইচ্ছার প্রকৃত মর্ম কি তা আমি তখন বুঝতে পারিনি···হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে ডেকে বললাম, 'আমার এ কি হল ?'···আমি দিনরাত তাঁর বাণী শোনবার অপেক্ষায় রইলাম তিনি আমায় কি বলবেন, আমায় কি করতে হবে তা জানবার জন্যে। তখন আমার স্মরণ হল, গ্রেপ্তার হবার একমাস বা আরও কিছু আগে আমার প্রতি একটি আহ্বান এসেছিল সকল কর্ম ছেড়ে দিতে, নির্জন বাসে যেতে এবং নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করতে···আমি ছিলাম দুর্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হইনি। আমার কাজ ছিল আমার নিকট অতিশয় প্রিয়।···তিনি আমায় পুনরায় বললেন, 'যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি।···তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যে তোমায় আমি এখানে এনেছি···তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরি করতে।"

জেলের সামনে খোলা জায়গায় বেড়াবার সময় তাঁর এক নূতন এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল :

"আমি জেলের দিকে তাকালাম···কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই ; আমাকে ঘিরে রয়েছে বাসুদেব। আমার 'সেল'-এর সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ায় আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার 'সেল'-এর দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছেন।···আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু



আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ

দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন, সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।"

আদালতেও একই অভিজ্ঞতা চলল :

"যখন মোকর্দমা ধরা হল···তখনও আমার সঙ্গে গেল সেই নিগূঢ় দৃষ্টি। ভগবান আমাকে বললেন,'···এখন দেখ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে, সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে।' আমি দেখলাম, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে, দেখলাম বিচারাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন নারায়ণ। আমি সরকার পক্ষের উকিলের দিকে তাকালাম, দেখলাম, সে তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রিয়, আমার বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন। তিনি বললেন, 'কেমন, এখন আর তোমার ভয় আছে ? আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে, আমি তাদের সকল কর্ম, সকল কথা নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করি।' "

আদালতে বিচারের সময় সারাদিন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কোন প্রশ্নের জবাব দিতেন না ; সাক্ষী কি বলছে, উকিল কি বলছে কিছুই তিনি শুনতেন না। শুনতেন কেবল অন্তরের বাণী : 'আমি তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, আর তুমি যে আদেশ চেয়েছ তা এই, আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, যাও, আমার কাজ কর।'

অলৌকিক ঘটনা

আরও অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা জেলে ঘটতে থাকে। দু'সপ্তাহ ধরে তিনি ধ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনতেন, তাঁকে দেখতেন। স্বামীজি সাধনার এক বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁকে উপদেশ দিতেন। যতক্ষণ না শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন, ততক্ষণ ধরে তাঁকে বোঝাতেন।

আর একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হল, শূন্যে ওঠা। যোগীদের পক্ষে এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা, কারণ যোগাভ্যাসের ফলে শরীর হালকা হয়ে যায়, কাজেই শূন্যে ওঠা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন ; হঠাৎ মনে হল, এরকম সিদ্ধি কি সম্ভব ? যেমনি ভাবা, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর শূন্যে উঠতে থাকে, কোন চেষ্টা না করে। জেলের প্রহরী ব্যাপারটা দেখে ফেলে আর অবাক হয়ে সে তা রটিয়ে বেড়ায়। তার ফলে এক সময় ভারতবর্ষে একটা ধারণা প্রচার হয়ে যায় যে শ্রীঅরবিন্দ শূন্যে অবস্থান করেন। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : "দিনের পর দিন ভগবান তাঁর আশ্চর্য বিভূতি সব আমায় দেখালেন ; যা তিনি দেখালেন, কোন বিজ্ঞান তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।"

বিচারের রায়ের দিন

বিচারক জজ বীচক্রফ্‌ট্‌ কেম্ব্রিজে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিনে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন, আর ইনি দ্বিতীয়। মামলায় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু। তিনি তাঁর আইন ব্যবসা বন্ধ রেখে দিনরাত এই মামলা নিয়ে খাটতেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে ভেবেছিলেন, চিত্তরঞ্জনকে কিছু কিছু নির্দেশ দেবেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে এই বাণী ধ্বনিত হল : 'এই লোকটিই তোমাকে বাঁচাবে···ওসব কাগজপত্র রেখে দাও। তুমি নয়, আমিই তাকে শিখিয়ে দেব।' সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিন্তে সমস্ত ভার ভগবানের হাতে তুলে দিলেন।

বিচারের শেষ দিন ৫ই মে, ১৯০৯ সাল। আদালতে সবাই স্তব্ধ, নীরব ; ভয়ে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছে। বুঝি বিচারক প্রাণদণ্ডের রায় দেবেন। তখন চিত্তরঞ্জন উঠে ওজস্বিনী ভাষায় যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, তার শক্তি যেন জজ, জুরী ও সমস্ত বিচারশালাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন :

"অরবিন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে, পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি তাঁকে স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী ও মানব-প্রেমিক বলে শ্রদ্ধা করবে। তাঁর বাণী শুধু ভারতেই নয়, সাগর পারে দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত হবে। সুতরাং আমার নিবেদন এই যে তাঁর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি শুধু এই আদালতের বিচারাধীন নন, তিনি দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের উচ্চ আদালতের সামনে।"

সেদিন কার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে ?

শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বিচারকের রায়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কী উল্লাস, কী উত্তেজনা কলকাতা শহরে, সমস্ত দেশে, সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে !

মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের চিত্তরঞ্জন নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। মহিলারা তাঁদের রাজকীয় সম্বর্ধনায় বিভূষিত করলেন, নানা অন্নব্যঞ্জনে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন। দীর্ঘ একবছর পরে তাঁদের কপালে এমন সুখ জুটল।

চিত্তরঞ্জনের যশ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

আলিপুরের পরে

উত্তরপাড়া অভিভাষণ

মুক্তি পাবার কিছুদিন পরে ৩০শে মে (১৯০৯) উত্তরপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ জগৎপ্রসিদ্ধ ওজস্বীন ভাষণ দেন। তাঁর প্রতি কী সম্মান, সম্বর্ধনা, ভালবাসা! ঘোড়ার গাড়িতে তুলে তাঁকে দর্শকেরা টেনে নিয়ে যায়; সভামঞ্চ ভরে যায় রাশি রাশি ফুলের স্তূপে। প্রায় দশ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে শ্রীঅরবিন্দের জেলজীবনের অলৌকিক কাহিনী, যা তোমরা একটু আগে পড়লে।

জেল থেকে শ্রীঅরবিন্দ যেন এক নূতন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন। একবছরব্যাপী গভীর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণের বাণী, দেশের সেবা ও স্বাধীনতা লাভ ছাড়া এক বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। "আমি এই জাতিকে তুলছি···তাদের জন্যে নয়, সমস্ত বিশ্বের জন্যে তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি যাতে তারা সমস্ত বিশ্বের সেবা করতে পারে।" এই হল সেই বাণী।

জেল থেকে বের হয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন সর্বত্র ভীষণ পরিবর্তন। দেশ যেন অর্ধমৃত। বেশির ভাগ নেতা জেলে। সরকারের দমননীতির ফলে হতাশা, ভয় ও অবসাদ দেশের বুকে চেপে রয়েছে। কিন্তু অসন্তোষ বাড়ছে ভেতরে ধোঁয়ার মতো, বিপ্লবের ধূম।

'কর্মযোগিন্'

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি স্থির করলেন, একাই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সভায় বক্তৃতা দিলেন, সম্মেলনে যোগ দিলেন, ইংরেজী ও বাংলায় দুটো কাগজ বের করলেন—'কর্মযোগিন্' (Karmayogin) ও 'ধর্ম্ম'।

তিনি একাই সমস্ত লেখা লিখতেন। সভা-সমিতিতে খুব কম লোক এলেও কাগজগুলির প্রচার কিন্তু বেড়ে গেল। বেশির ভাগ লেখা থাকত ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে। রাজনীতিমূলক লেখাগুলিও ছিল এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আবার তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন। সরকারের সঙ্গে কোন আপস নয়, সহযোগিতা নয়। সরকার যেসব শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করলেন, সেগুলি যে আসলে গিল্‌টি সোনা, কাজেই গ্রহণের অযোগ্য শ্রীঅরবিন্দ তা তাঁর সূক্ষ্ম ও জোরালো

ভাষায় বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

সরকার প্রমাদ গণল ; ভাবল, 'ম'রেও না মরে রাম এ কেমন বৈরী ?'—অরবিন্দকে সরাতে না পারলে দেশে শান্তি আসবে না ; ব্রিটিশ রাজত্ব টিকবে না। ইতিমধ্যে পুলিস পুরাদমে দমননীতি চালাল ; গ্রেপ্তার, জেল, নির্বাসন ইত্যাদি নানারকমের শাস্তি দিতে কসুর করল না।

শ্রীঅরবিন্দ এই দমননীতির উদ্দেশ্য ও অর্থ ব্যাখ্যা করে লিখলেন :

"সরকার যদি মনে করেন যে এই দমনের ফলে জাতির জাগরণ থেমে যাবে, তাহলে বলব এটা মারাত্মক ভুল। ভগবানের আদেশে যে জাতি একবার জেগে উঠেছে তাকে অত্যাচার দমাতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী···দমন হল ভগবানের হাতুড়ি, আমাদের পিটিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলেছেন এক প্রবল জাতি, যাতে আমরা তাঁর কাজের যন্ত্র হতে পারি।"

সরকার মরিয়া হয়ে উঠল। অরবিন্দকে সরাতেই হবে। এবার একেবারে নির্বাসন।

শ্রীঅরবিন্দ সরকারের এই মতলব শুনে পরিহাস করে বললেন, "আমি নির্বাসনের যোগ্যতা লাভ করেছি।" নিবেদিতা খবরটা শ্রীঅরবিন্দকে জানালেন এবং ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশ থেকে কাজ চালাতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি নিবেদিতাকে জানালেন যে 'কর্মযোগিন্'-এ 'খোলা 'চিঠি' নাম দিয়ে তিনি একটা নিবন্ধ লিখবেন। তাতেই সরকারের মতলব বদলে যাবে। কার্যত তাই হল। সরকার তার মতলব স্থগিত রাখল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যখন রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করে আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্যে ওয়ারেণ্ট বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করল।

চন্দননগর যাত্রা

"১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গদের নিয়ে বসে আছেন 'কর্মযোগিন্' অফিসে। তিনি 'অটোম্যাটিক রাইটিং' বা স্বয়ংক্রিয় লেখা লিখছিলেন এবং কয়েকটি তরুণকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আসর কখনও গুরুগম্ভীর বাণীতে স্তব্ধ আবার হাস্যকৌতুকে উচ্ছসিত।···তখন সেই ঘরে প্রকাশ করলেন রামবাবু (রামচন্দ্র মজুমদার, 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' কাগজের সহকারী)···উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জানালেন যে, তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।···আমরা

সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম! অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন, তারপর বললেন—

'আমি চন্দননগর যাব।'

অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেন!···সর্বাগ্রে অরবিন্দ ও রামবাবু তাঁদের পশ্চাতে কিছুদূরে···বীরেন এবং বীরেনের পশ্চাতে কিছুদূরে আমি—এইরকমের একটা 'বোবাযাত্রা' তৈরী হল।

অরবিন্দ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ এ বাড়ি গোয়েন্দা পুলিসের নজরবন্দী থাকত···কিন্তু দেখা গেল সেদিন···সে বাড়ির কাছে, কিনারে, পুলিসের কোন চিহ্ন নেই!···প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ চলে আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম।···নৌকার এক মাঝিকে উদ্দেশ্য করে রামবাবু হাঁক দিলেন—আরে, ভাড়া যাবি?

রামবাবুর এই কথা কটি এবং তার গলার আওয়াজ আজও যেন আমার কানে লেগে আছে।···কথাবার্তা শেষে অরবিন্দ সেই নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি। রামবাবু বিদায় নিলেন।···

নৌকা খুলে দিল। আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম। নদীবক্ষে বোঝা গেল যে সেটা শুক্লপক্ষ, চতুর্দিক জ্যোৎস্নালোকে হাস্যোজ্জ্বল···কি তিথি জানিনে, হয়তো সেদিন—

'শুক্লা একাদশী
নিদ্রাহারা শশী,
স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।'

···সারারাত চলে খুব ভোরে নৌকা চন্দননগরে পৌঁছল। অরবিন্দ বীরেনকে চন্দননগরে খ্যাতনামা নাগরিক পুরাতন বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠান। কিন্তু রায় মহাশয় জানালেন যে অরবিন্দকে কোন রকম সাহায্য করতে তিনি অসমর্থ।··· বীরেনের মারফত অরবিন্দকে ফ্রান্সে যেতে বললেন। বিপ্লবী শ্রীযুত মতিলাল রায় মহাশয় অরবিন্দের আগমন-সংবাদ পেয়ে সাগ্রহে তাঁকে আপন বাটিতে স্থান দিলেন। ···মতিবাবুর বাড়িতে অরবিন্দ নিরাপদে অধিষ্ঠিত হলে পর বীরেন ও আমি সেই নৌকাতেই কলিকাতা রওনা হলাম।"*

*'স্মৃতিকথা'—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

"গ্রেপ্তারের খবর শুনে আমি ভাবছি, কি করব। তখন হঠাৎ স্পষ্ট আদেশ পেলাম, 'চন্দননগরে চলে যাও।' আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম। ভয়ে বা নিরাশায় নয়, যাতে আমার যোগের ব্যাঘাত না হয় এই জন্যে আমি চলে এলাম। রাজনৈতিক সম্পর্ক আমি ছেড়ে দিলাম, কারণ আমি জানলাম যে কাজ আমি শুরু করেছি, তা এগিয়ে যাবেই এবং তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে আমার উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই। নিবেদিতাকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি 'কর্মযোগিন্' কাজের ভার নেন।"

দশম অধ্যায়

চন্দননগর

শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে প্রায় দেড় মাস রইলেন, প্রথমে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়িতে, পরে আলাদা দু'তিনটি জায়গায়। সরকার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না, শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মীরাও না। তিনি মতিলালের সঙ্গে শর্ত করেছিলেন যেন তাঁর অজ্ঞাতবাস ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের এই গোপন জীবনের কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। কেবল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় কিছু খবর পাওয়া যায়। তিনি দিনরাত বাড়িতে বন্ধ থাকতেন। কি করে তাঁর সময় কাটত একলা, সঙ্গীহীন অবস্থায়? মতিলালের বই 'জীবনসঙ্গিনী'তে আমরা কিছু আভাস পাই। তিনি লিখেছেন যে শ্রীঅরবিন্দ তখন ভগবানে সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ! যখন কথা বলতেন যেন অন্য কেউ তাঁর ভেতর দিয়ে কথা বলছে। যখন সামনে খাবার রাখা হত, তিনি একটু চেয়ে দেখতেন, সামান্য মাত্র খেতেন, কলের পুতুলের মতো। খাবার সময়ও তিনি তন্ময়। খোলা চোখে ধ্যান করতেন, নানা সূক্ষ্ম রূপ ও দৃশ্য দেখতেন। চারটি দেবীমূর্তির দর্শন পান। পণ্ডিচেরীতে তাঁদের নাম জানতে পারেন; ইলা, ভারতী, মাহি ও সরস্বতী —তাঁরা বেদের ঈশ্বরী···।

এই সময় তিনি মতিলালকে যোগ ও সাধনা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। শুধু মতিলাল এবং তাঁর দু'চারজন সহকারীর সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ ছিল।

চন্দননগরে থাকা যখন আর নিরাপদ মনে হল না তখন শ্রীঅরবিন্দ আবার আদেশ পেলেন,

'পণ্ডিচেরী যাও।'

তোমরা লক্ষ্য করবে, কি করে সকল সংকট মুহূর্তে তিনি ভগবানের বাণী শুনছেন, ভগবানই তাঁকে পদে পদে চালাচ্ছেন ও রক্ষা করছেন। তিনি মতিলালকে যাত্রার বন্দোবস্ত করতে বললেন। নিজে দুটো চিঠি লিখলেন, একটি উত্তরপাড়ায় অমর চট্টোপাধ্যায়কে অন্যটি কলকাতায় তাঁর মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্রকে, যেন তাঁরা অবিলম্বে তাঁর পণ্ডিচেরী যাত্রার বন্দোবস্ত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মণি (সুরেশ চক্রবর্তী) একটা কাগজের চিরকুট পেলেন। মণির ভাষায়: "···হঠাৎ একদিন ছোট্ট টুকরো কাগজে···অরবিন্দের হাতের লেখা তিনচার লাইন পেলাম···আমাকে পণ্ডিচেরীতে যেতে হবে তাঁর জন্যে একটি বাড়ি ঠিক করে রাখতে···।" সেখানে মণি শ্রীনিবাসাচারী বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি পুরাতন বিপ্লবী, একটি তামিল কাগজের সম্পাদক। তাঁর সহকর্মী হলেন সুপ্রসিদ্ধ তামিল কবি সুব্রহ্মণিয়া ভারতী।

মণি ফিরিঙ্গি সাহেবের বেশে হাওড়ায় রওনা হলেন; সেখানে সুকুমার মিত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিরিশটি টাকা দিয়ে মণিকে তিনি ট্রেনে তুলে দিলেন; সে দিনটি ছিল ২৮শে মার্চ। মণি পণ্ডিচেরীতে পৌঁছলেন ৩১শে মার্চ। যাবার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী মনোরম ভাষায় তিনি এঁকেছেন তাঁর 'স্মৃতিকথায়'।

দেবতা বিদায়

এখন দেখা যাক, ওদিকে শ্রীঅরবিন্দের যাত্রার কি বন্দোবস্ত হল। বাস্তবিক পক্ষে যা ঘটল, তা একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী। তোমরা মনে রাখবে যে শ্রীঅরবিন্দকে অত্যন্ত গোপনে চন্দননগর ছেড়ে আসতে হবে, কাকপক্ষীও যেন না জানে। যে কোন মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হতে পারেন। পুলিস তাঁকে ধরবার জন্যে জাল পেতেছে। বিপদ পদে পদে। কাজেই ব্যাপারটা অতিশয় কঠিন।

অমর চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের চিঠি পেয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। সুকুমার মিত্র শ্রীঅরবিন্দের আদেশ পেয়ে তাঁর যাত্রার বন্দোবস্ত করছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি শ্রীঅরবিন্দের আত্মীয়, সব সময়ই পুলিস তাঁকে নজরে রেখেছে: তাঁকে অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছে। তিনি দুটো ট্রাঙ্ক তৈরি করলেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গী বিজয় নাগের জন্যে। নগেন গুহরায় বলে একজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী যুবককে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করলেন। এখন নগেনের জবানীতে শোন তিনি কি ভাবে পণ্ডিচেরী যাত্রায় সাহায্য করেছেন।

তিনি লিখেছেন: "সুকুমারদা আমাকে ট্রাঙ্ক দুটি আমার মেসে রাখতে বললেন। আমি বাক্সগুলি ভারি দেখে ঠাট্টা করে বললাম, 'বোমা, পিস্তল, নেই তো?' তিনিও হেসে বললেন, 'চুপ করে কাজ করে যা।' পরের দিন দুই ব্যক্তির নাম ধাম লিখে দুটো দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনতে বললেন। তাঁরা

কলম্বো যাবেন, ডুপ্লে (Dupleix) জাহাজে। কলম্বোর টিকেট কেনার উদ্দেশ্য ছিল পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। যাত্রীদের নাম দিলেন যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারলাম না!

একদিন কি দুদিন পরে, ১৯১০ সালের ১লা এপ্রিল। সুকুমারদা আমায় বললেন, 'আজ দুপুরবেলা একখানা নৌকা করে গঙ্গার ওপারে···ঘাটে চলে যাবে। ট্রাঙ্ক দুটো এখনই গিয়ে জাহাজের কেবিনে রেখে এস। সে ঘাটে একখানা নৌকা থেকে দু'জন লোক তোমাদের নৌকায় উঠবেন। তাঁদের কলম্বোর জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।' আমি প্রশ্ন করলাম—'নৌকার লোককে চিনব কি করে ?'···হঠাৎ বিজলী চমকের মতো আলোকসম্পাত হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার অরো-দা যাচ্ছেন না তো ?' তিনি বিস্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, 'বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো দেখছি···ঠিকই ধরেছ ; সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।'

কি কারণে আমাদের গঙ্গা পাড়ি দিতে বিলম্ব হল। আমাদের দেরি দেখে শ্রীঅরবিন্দের নৌকা অমরদাকে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজের দিকে রওনা হল। আমরাও তাঁদের দেখা না পেয়ে ফিরে এলাম।"

এই বিলম্বের দরুন যে বিভ্রাট ঘটল, সেই কাহিনী শোন :

"সুকুমারদাকে এই খবর জানাই। তিনি তৎক্ষণাৎ কেবিন থেকে ট্রাঙ্কগুলি ফেরত আনতে বললেন। তখন সন্ধ্যা ছটা। জাহাজে গিয়ে শুনলাম ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করে চলে গেছেন। আমি ক্যাপ্টেনের কাছে ডাক্তারের ঠিকানা নিয়ে একটি কুলির সাহায্যে ট্রাঙ্কগুলি গাড়িতে তুলে নিলাম। কুলি বকশিসের লোভে বলল, 'বাবু, আমি ডাক্তারের বাড়ি চিনি ; তাঁর চাকর আমার জানা লোক। আমি সব ঠিক করে দেব।' আমি আশ্বস্ত হয়ে কুলিকে অপেক্ষা করতে বলে সুকুমারদার কাছে ফিরে গেলাম।

এদিকে হয়েছে কি, শ্রীঅরবিন্দ পূর্বের বন্দোবস্তমত চাঁদপাল ঘাটে এসে দেখলেন কেউ অপেক্ষায় নেই। তখন অমরদা গাড়ি করে শ্রীঅরবিন্দকে সুকুমারের বাড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। সুকুমার বাড়ি নেই ; কাজেই আবার তারা ঘাটে ফিরে এলেন।

কিরকম বিপজ্জনক অবস্থা ভেবে দেখ। যাকে বলে ঘাটে এসে নৌকা ডোবার মতো। নগেন গুহরায় বলছেন :

"সুকুমারদা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। তিনি আদেশ দিলেন, 'এখখুনি চাঁদপাল ঘাটে ফিরে যাও, আর শ্রীঅরবিন্দকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে

যাও।' আমি ছুটলাম ; দেখলাম তাঁর গাড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কুলিটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তোমার বাবুরা এসে গেছে।...রাত হয়ে গেল, আর দেরি হলে সাহেব ঘুমিয়ে পড়বে।' কুলি ট্রাঙ্ক দুটি শ্রীঅরবিন্দের গাড়িতে তুলে দিল, সে উঠে বসল সহিসের পাশে। আমি আর অমরদা বসলাম সামনের দিকে, শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় নাগ পিছনের আসনে।

ডাক্তারের বাড়ি পেঁাছে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা বাইরে বসে থাকতে হল। কুলি ডাক্তারের চাকরকে খবর দিল। আমরা নানা গল্পে সময় কাটাচ্ছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একেবারে মৌন। কুলিটার কি মনে হল, সে আমার কানের কাছে চুপি চুপি বলল, 'তোমার ওই বড়বাবুটা ভয় পেল নাকি ? সাহেব-সুবার কাছে আর যায়নি বুঝি ? বলে দাও না, সাহেব ভাল লোক, কিছু ভয় নেই।' আমি বললাম, 'না রে, ভয় পাবে কেন ? ম্যালেরিয়ায় ভুগে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছেন, শরীর খারাপ।' কিন্তু কুলি মোটেই আশ্বস্ত হল না। চোখের পলকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে সে বলল. 'ভয় পাচ্ছ কেন বাবু ? সাহেব বড় ভাল লোক!' সে অরবিন্দের দুই বাহু চেপে জোরে ঝাঁকুনি দিল। আমরা তিনজনই নিঃশব্দে হাসলাম, শ্রীঅরবিন্দও মৃদু হাসলেন।

দশ মিনিট পর তাঁরা সার্টিফিকেট নিয়ে বের হলেন। বিজয় নাগের কাছে শুনলাম, কয়েক মিনিটের আলাপেই সাহেব বুঝতে পারলেন যে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা হয়েছে ইংলণ্ডে। (তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনে সাহেবের এই ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়।)

যাই হোক, গাড়ি চাঁদপাল ঘাটের দিকে ছুটল। রাত প্রায় এগারোটা। শ্রীঅরবিন্দ 'নিরুদ্বেগ—যেন একটি সমাধিস্থ মূর্তি।' জিনিসপত্র নিয়ে আমরা চারজন কেবিনে ঢুকলাম। বিজয় নাগ শ্রীঅরবিন্দের জন্য বিছানা করছেন। অমরদা আর আমি শ্রীঅরবিন্দের মুখোমুখি। অমরদা জামার পকেট থেকে কতগুলি ভাঁজ করা নোট নিয়ে মিছরিবাবুর নাম করে তাঁর হাতে দিলেন। তিনি নিঃশব্দে হাত পেতে নোটগুলি নিলেন। তারপর আনত ললাট শ্রীঅরবিন্দের পায়ে রেখে আমি প্রণতি নিবেদন করলাম, কৃতার্থ হলাম দেবদেহ স্পর্শে। অমরদা নতশিরে জোড় হাত কপালে ছুঁয়ে শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার করলেন। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টি হতে ঝরে পড়ল আশীর্বাদ।"*

১৯১০ সাল, ১লা এপ্রিল। ভোরে জাহাজ কলকাতা ছাড়ল।

* 'মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ'—নগেন্দ্রনাথ গুহরায়

একাদশ অধ্যায়

পণ্ডিচেরী

তপস্যার গুহা

এদিকে মণি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে থাকবার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন দেখা যাক। মণি পণ্ডিচেরীতে পৌঁছলেন ৩১শে মার্চ। তিনি শ্রীনিবাসাচারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পরিচয়পত্র দিলেন এবং জানালেন ৪ঠা এপ্রিল ডুপ্লে জাহাজে শ্রীঅরবিন্দ এসে পৌঁছবেন। তাঁর থাকবার কিছু ব্যবস্থা করা চাই। শ্রীনিবাসাচারী সুব্রহ্মণিয়া ভারতী প্রভৃতি বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও সে সময় পণ্ডিচেরীতে এসে আশ্রয় নেন। তাঁরা মণিকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করেন। তাঁদের মতে, শ্রীঅরবিন্দ এত বড় নেতা, তিনি পণ্ডিচেরীর মতো নগণ্য শহরে আসবেন কোন দুঃখে ? কিন্তু তাঁরা মুখে বললেন শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে এলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। মণি তো চোখে আঁধার দেখলেন। প্রকাশ্যে জানাজানি হলে শ্রীঅরবিন্দের যে হাজতে বাস অনিবার্য, একথা অতি কষ্টে তাঁদের বোঝালেন ; কিন্তু তাঁরা বাড়ি ঠিক করতে নারাজ। অবশেষে মণির নিতান্ত অনুরোধে ৩রা এপ্রিল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা একটা বাড়ি দেখালেন ; যেমন নোংরা পল্লী, তেমনি অন্ধকার ঘর।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০ সাল। ডুপ্লে জাহাজ পণ্ডিচেরী পৌঁছল বিকেল ৪টার সময়। নৌকো করে শ্রীনিবাসাচারী ও মণি জাহাজের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল শ্রীঅরবিন্দ আর বিজয় জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে। শ্রীনিবাসাচারী একটি গাড়ি করে শ্রীঅরবিন্দকে শহরে নিয়ে গেলেন ; পেছনে মণি চললেন মালপত্র নিয়ে একটি 'পুশপুশ' গাড়িতে। মণি পৌঁছে দেখলেন তিনতলা বাড়ি, শ্রীঅরবিন্দ একটা ঝকঝকে ছোট ঘরে চেয়ারে বসে আছেন। মণি অবাক ! দুবছর পরে তিনি এর রহস্য জানতে পারেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের দূত না হয়ে পুলিসের চরও হতে পারেন, এই সন্দেহ করে তাকে অন্য একটা বাড়ি দেখান হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল বাড়িরও বন্দোবস্ত করা হয়। যদি শ্রীঅরবিন্দের আসার খবর মিথ্যা প্রমাণিত হত, তাহলে মণিকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পণ্ডিচেরীর ধনী শঙ্কর চেট্টির বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের

পাকাপাকি বাসস্থান হল। এই বাড়িতেই বিবেকানন্দ দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে অতিথি হয়েছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে এসেই শ্রীঅরবিন্দ গভীর সাধনায় ডুব দিলেন। মণি ও বিজয়কে বললেন, তিনি একেবারে নির্জনে থাকবেন ; বিশেষ কারণ ছাড়া কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবেন না। শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই নির্জনতায় অভ্যস্ত। পুলিসের নজর এড়াবার জন্যও তাঁকে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মণি আর বিজয় বোধহয় তাঁর শারীরিক সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন। পরে কেবল শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি দুচারজন তামিল বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কিছু আলাপসালাপ করতেন ; তাঁদের আর একজন হলেন প্রসিদ্ধ তামিল কবি সুব্রহ্মণিয়া ভারতী।

এই বাড়িতে সপ্তাখানেক পরে একজন বিশিষ্ট ফরাসী পণ্ডিত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, নাম পল রিশার। তিনি রাজনৈতিক নির্বাচন ব্যাপারে ফরাসীদেশ থেকে আসেন। সে সময় মীরা—যিনি আমাদের শ্রীমা—তাঁকে বলেন এমন কোন যোগীর খোঁজ নিতে যিনি একটি যোগচক্রের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন, এবং যিনি তা পারবেন, তিনিই হবেন তাঁর যোগ্য গুরু। চক্রের নকশাটি দেখামাত্র শ্রীঅরবিন্দ তার ব্যাখ্যা বলে দিলেন।

এমনি করেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমার যোগসূত্র স্থাপিত হল। আমরা পরে দেখব যে মা তাঁর দেশে একা যোগাভ্যাস করতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাইরের কোন পরিচয় না থাকলেও ভেতরে তাঁর সঙ্গে সূক্ষ্ম যোগাযোগ ছিল।

উত্তর যোগী

যোগীদের মাঝে এরকম সূক্ষ্ম পরিচয় সর্বদাই ঘটে এবং এটাই তাঁদের সত্য পরিচয়। এই জাতীয় আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দক্ষিণ দেশে নাগাই জাপাতা নামে এক বিখ্যাত যোগী ছিলেন। দেহত্যাগের সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে ডাকলেন। একজন শিষ্য ছিলেন ধনী জমিদার, নাম রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। তিনি গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে কে আমাদের ভার নেবেন ?"

গুরু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'উত্তর দেশ থেকে এক পূর্ণযোগী এদেশে আসছেন। তাঁর সাহায্য নিতে পার।"

"কিন্তু কত যোগীই তো যাওয়া-আসা করছেন ; এঁকে চেনবার উপায় কি ?"

"তাঁকে চেনবার দুটো উপায় আছে; প্রথমত, তিনি এখানে আসছেন আশ্রয় খুঁজতে। দ্বিতীয়ত, তার বাক্যের দ্বারা তাঁকে চেনা যাবে।"

এই তিনটি বাক্য হল শ্রীঅরবিন্দের তিনটি 'পাগলামি' যেগুলি 'শ্রীঅরবিন্দের পত্রে' তিনি মৃণালিনীকে লেখেন। এই গোপনীয় চিঠিগুলি পুলিস বাজেয়াপ্ত করে আদালতে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে। সেজন্যে সর্বত্র চিঠিগুলির কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে! জাপাতা শ্রীঅরবিন্দকে চোখেও দেখেননি, অথচ তিনি যোগলব্ধ জ্ঞানে শিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

এই সংকেতগুলির সাহায্যে আয়েঙ্গার শ্রীঅরবিন্দকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করলেন; তাঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে গুরুর অন্তিম আশ্বাস বাণীর কথা জানালেন তাঁকে এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ ভক্ত হলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের 'যৌগিক সাধন' বইটি ছাপাবার খরচ বহন করেন। বইটির লেখকের নাম দেওয়া হয় 'উত্তর যোগী', যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ আসেন উত্তর দেশ থেকে। লেখাটিও রহস্যময়, কারণ লেখাটি আগাগোড়া স্বয়ংক্রিয় লেখার ফল। শ্রীঅরবিন্দ কলমটা নিয়ে বসতেন আর অনর্গল লিখে যেতেন, কোন ভাবনা-চিন্তা না করে। কে যেন তাঁকে যন্ত্র করে লিখে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে লেখার আরম্ভে ও শেষে তিনি প্রত্যেকবার রামমোহন রায়ের দণ্ডায়মান মূর্তিটি দেখতে পেতেন। তাহলে বলা চলে যে রামমোহন রায়ের 'আত্মা'ই এই বইয়ের লেখক, শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্র মাত্র। এইসব স্বয়ংক্রিয় লেখার কথা আগেও তোমাদের বলেছি। যাই হোক, তাঁর নিজের লেখা নয় বলে পরে বইটি ছাপান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আয়েঙ্গার এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও করেছিলেন।

উপবাস ব্রত

এই বাড়িতে আর একটি ঘটনা ঘটে যা মনে রাখার মতো। কি কারণে ঠিক জানা নেই, শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ উপোস করতে আরম্ভ করলেন এবং এক নাগাড়ে একুশ দিন। আলিপুর জেলেও তিনি দশ দিন উপোস করেছিলেন। কিন্তু এর অসাধারণত্ব হল এই যে তিনি উপোস ভাঙলেন একেবারে স্বাভাবিকভাবে, সবকিছু খেয়ে। এটা হল চিকিৎসা-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং বিপজ্জনক। এই শাস্ত্রমতে উপোস ভাঙতে হয় অল্প অল্প করে, নইলে ভয়ানক অসুখের সম্ভাবনা। অথচ শ্রীঅরবিন্দের কোন ক্ষতিই হল না, তিনি দিব্যি বেঁচে-বর্তে রইলেন।

এখন তোমাদের হয়তো জানতে কৌতূহল হবে, কেন তিনি উপোস করলেন। এ কি শুধু খেয়াল, না, এর পেছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে? শ্রীঅরবিন্দ খেয়ালের বশে কিছু করেন না। তাঁর মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে মানুষের আহারের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না এটাই তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন; খাদ্যসমস্যাটির সমাধানও প্রায় করেছিলেন। দেখলেন যে মানুষ কোন কিছু না খেয়েও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। তিনি বলছেন:

"শঙ্কর চেট্টির বাড়িতে আমি প্রায় তেইশ দিন উপোস করেছিলাম। রোজ আট ঘণ্টা করে হাঁটতাম; আমার সাধনা এবং লেখাপড়ার কাজও নিয়মমত চলত। তেইশ দিনের পরেও কোন দুর্বলতা অনুভব করিনি। আমার ধারণা হল যে বেঁচে থাকার পক্ষে খাওয়া দাওয়াটা অপরিহার্য নয়, কিন্তু দেখলাম যে শরীর রোগা হয়ে যাচ্ছে আর মাংসপেশীর ক্ষয় হচ্ছে। সেটা কি করে বন্ধ করা যায় অথবা অন্য কোন উপায়ে শরীর পুষ্ট করা যায় কি না তার কোন ব্যবস্থা খুঁজে পেলাম না। কাজেই বুঝলাম শরীর ধারণের পক্ষে এখনও আহারের প্রয়োজন আছে।"

কিন্তু এরকম উপোসই-বা কি করে সম্ভব? উপোস সম্ভব হলেও আট ঘণ্টা করে হাঁটা? তিনি বলেন যে আহার্যের উপর নির্ভর না করে প্রাণের স্তর থেকে শক্তি সংগ্রহ করা যায়। এটা অবশ্য যোগের ব্যাপার। তবে এটা ঠিক যে আমরা সবসময়ই প্রাণের স্তর থেকে এই শক্তি সংগ্রহ করছি। এটা শিশুদের বা পশুদের বেলায় খুব লক্ষ্য করা যায়।

পণ্ডিচেরী জীবনের কঠোরতা

প্রায় ছ'মাসের পর শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্টির বাড়ি ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একবারও বাইরে যাননি। পুলিস ও জনসাধারণ এখন জেনে ফেলেছে যে তিনি পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিস তখন থেকে তাঁর দিকে নজর রেখে চলেছে।

এই বাড়ি ছাড়ার পর তাঁকে চার বছরে চার-পাঁচটা বাড়ি বদলাতে হল, প্রধান কারণ অর্থাভাব। তিনি আবার একা নন, তিন-চারজন সঙ্গীরও ভরণপোষণ করতে হয় তাঁকে। বহু বছর তাঁদের ভয়ানক টানাটানি চলে। ছোট ঘর, অতি সামান্য আসবাব-পত্র; মেজেতে শোওয়া। সকলের জন্যে একটা মাত্র গামছা এবং তাদের ব্যবহারের শেষে শ্রীঅরবিন্দের স্নান ও ব্যবহার। শ্রীঅরবিন্দের জন্যে একটি পুরোনো নড়বড়ে খাট, তেমনি

পুরোনো ছেঁড়া তোশক। যথেষ্ট খাবার জোটে না। তিনি কৌতুক করে কোন বন্ধুকে লিখছেন, "অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আট আনা পয়সা মাত্র সম্বল···ভগবান প্রয়োজনমত দেন বটে, কিন্তু দিতে তাঁর একটু দেরি হয়।" অর্থাভাবের সঙ্গে আবার পুলিসের উপদ্রব।

বাইরে থেকে টাকা পাঠানোও মুশকিল ছিল, কেননা শ্রীঅরবিন্দের মতো বিপ্লবী নেতাকে সাহায্য করলে পুলিসের বিষনজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটিশরাজ কোনদিন বিশ্বাস করতে পারেনি যে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী এসেছেন যোগ করতে। তাদের মতে, ওসব বুজরুকি, আসল মতলব হল গোপনে এখান থেকে বিপ্লব আন্দোলন চালানো; বোমা, পিস্তল জোগাড় করে ভারতবর্ষে চালান দেওয়া। সরকারের মতে, অরবিন্দ হলেন মারাত্মক লোক, সারা ভারতে তাঁর জুড়ি নেই। কাজেই পুলিস সবসময় প্রকাশ্যে ও গোপনে শ্রীঅরবিন্দের উপর চোখ রাখত। তাঁকে পণ্ডিচেরী থেকে সরাবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু রাখে হরি মারে কে?

গুপ্তচর কাহিনী: প্রধান ষড়যন্ত্র

সরকারের এই অপচেষ্টার অন্ততপক্ষে তিনটি কাহিনী জানা আছে, খুব চমকপ্রদ! ব্রিটিশরাজ সর্বত্র তার জাল পেতেছে; মাদ্রাজে চর, পণ্ডিচেরীর পথে চর, শহরে চর। দেখতে তারা সাদাসিধে ভদ্রলোক, কিন্তু ভেতরে কৃষ্ণবর্ণ—গুপ্তচর, সি. আই. ডি.। উপরন্তু পণ্ডিচেরীতে তখন ছিল গুণ্ডার রাজত্ব, বিশেষ করে রাজনৈতিক নির্বাচনের সময় একেবারে নরক গুলজার। খুনখারাপি, মারামারি রক্তগঙ্গার দৃশ্য। ঠিক নির্বাচন যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরাজ তার রণনীতির অতিশয় কুৎসিৎ পথ অবলম্বন করল।

গোয়েন্দারা একজন দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে চক্রান্ত করল যে তার গুণ্ডারা কোনমতে শ্রীঅরবিন্দকে পাকড়াও করে ফরাসী ভারতের সীমান্তে নিয়ে যাবে, আর সরকার তখন কোন মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। শ্রীঅরবিন্দের পার্শ্বচরগণ এই দুরভিসন্ধির খবর পেয়ে রুখে দাঁড়াল। 'যুদ্ধং দেহি'র জন্যে তাঁরা তৈরী, অস্ত্র 'এসিড বোতল'। সারারাত তারা জেগে রইল, কিন্তু আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত কেউ এল না। শুধু তাই নয়, সেদিনই এই নেতার বিরুদ্ধে তার বিপক্ষ দল পুলিসের দ্বারা গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করল; সেই ভয়ে তাকেই পণ্ডিচেরী ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হল। ভগবানের কী বিচিত্র লীলা!

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র

কিন্তু তোমরা মনে ক'রোনা ব্রিটিশ সিংহ এত সহজে হার মানবে ; বিশেষ করে ভারতবর্ষ থেকে বিপ্লবীরা পণ্ডিচেরীতে এসে যত বেশি আড্ডা জমাতে লাগল, সিংহরাজ ততই আক্রোশে ফুলতে লাগল। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের মাথায় এখন এক চমৎকার মতলব গজালো যার দ্বারা সমস্ত বিপ্লবী দলটিকে তারা একসঙ্গে জেলে পুরতে পারে। গোয়েন্দারা নানা দলিলপত্র নকল করল, ফটো সংগ্রহ করল, চিঠিপত্র ম্যাপ জোগাড় করে সবগুলি একত্রে একটি টিনে পুরে এক বিপ্লবীর বাড়ির কুয়োয় ফেলে দিল। এই বিপ্লবী ছিল শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু ; কাজেই গোয়েন্দাদের আসল উদ্দেশ্যটি কি বুঝতে পারছ। এই ব্যাপারে তারা সাহায্য নিল এক পণ্ডিচেরী বাসিন্দার ; তার নাম মুরগেশন্। সে ফরাসী পুলিসকে জানাল যে বিপ্লবীদের ঘরবাড়ি যদি খানাতল্লাশি করা হয়, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্রের অনেক প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু আবার, রাখে হরি মারে কে ? সরকারের এমন পাকা চাল বানচাল হয়ে গেল। সেই বিপ্লবীর চাকরানি কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে সেই টিনটিও উঠে এল। বিপ্লবীটি তৎক্ষণাৎ শ্রীঅরবিন্দের কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁর পরামর্শমত ফরাসী পুলিসকে খবর দিল। পুলিস সেই টিনের মধ্যে পেল রাজদ্রোহ-মূলক লেখা, কালীর মূর্তি আঁকা কাগজপত্র, কিছু বাংলা লেখা, ইত্যাদি। গোয়েন্দাদের মতলব ছিল যে এই বিপ্লবীরা বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করছে, আর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এটা প্রমাণ করা।

বাড়িঘর খানাতল্লাশি চলল। শেষে ফরাসী ম্যাজিস্ট্রেট এলেন শ্রীঅরবিন্দের ঘরে। অতি সাধারণ একটি ঘর, সামান্যমাত্র আসবাব। টেবিলের ড্রয়ারে তিনি পেলেন কিছু বই এবং গ্রীক ভাষায় লেখা কিছু কাগজ। গ্রীক ভাষা দেখে সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ! "এ্যা! ইনি গ্রীক, লাটিন জানেন।" এই শব্দগুলি ছাড়া সাহেবের আর কোন কথা বের হল না।

পণ্ডিত-যোগীর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দলবলসহ বিদায় নিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন যেন তিনি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর অফিসে আসেন। সন্ধ্যাবেলার সেই অবসর সময় তাঁরা সাহিত্য-আলোচনায় উপভোগ করতে পারবেন। ওদিকে মিথ্যা নালিশ করছে বলে তিনি মুরগেশনকে এমন ধমক দিলেন যে রাতারাতি পণ্ডিচেরী থেকে সে উধাও হল।

আসল ব্যাপার হল, ফরাসী সরকার শ্রীঅরবিন্দের মতো 'বিপ্লবী'দের প্রতি খুব

সদয় ছিলেন ; তাঁদের রক্ষা করা, আশ্রয় দেওয়া যেন সরকারের কর্তব্য—বলতে পার কতকটা ফরাসী বিদ্রোহের মনোভাব। কিন্তু ব্রিটিশরাজ সেটা বরদাস্ত করবে কেন ? ক্রমাগত তারা ফরাসী সরকারের উপর চাপ দিতে লাগল যে, হয় বিপ্লবীদের দেশান্তরে পাঠানো হোক, নয়তো ইংরেজের হাতে সঁপে দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত একটি প্রস্তাব পাঠানো হল যে ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়ায় শ্রীঅরবিন্দকে দলবল সহ পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

শ্রীঅরবিন্দের কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে তামিল কবি ভারতী, উত্তেজিত অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে বললেন, "চলুন, আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাই। চমৎকার সুযোগ এসেছে ! আপনি কি বলেন ?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু চুপ থেকে বললেন, "মিঃ ভারতী, আমি তিলমাত্র পণ্ডিচেরী থেকে নড়ব না। আমি জানি আমার কিছুই হবে না। তবে, আপনার যা খুশি আপনি তাই করতে পারেন।" অন্যরা অগত্যা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

তৃতীয় ষড়যন্ত্র

এটা আরও অদ্ভুত, অভাবনীয়, এমনকি 'বীভৎস'।

পুলিসের দুটি বড় 'ষড়যন্ত্র' ব্যর্থ হল, কিন্তু তাদের চেষ্টার বিরাম হল না। মিথ্যা সংবাদ, কাল্পনিক 'শার্লক হোম্‌স্' কাহিনী সব জোগাড় করে তারা সরকারের কাছে পেশ করতে লাগল।

শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে Guest House-এ (অতিথি ভবন) বাস করছেন, বর্তমান নাম Dortoir (দর্‌তোয়ার)। দুজন নূতন সঙ্গী জুটেছে ; একজন টি. বি. রোগী নগেন নাগ, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী বিজয় নাগের আত্মীয়। পণ্ডিচেরী এসেছেন হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে আর শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তি তাঁর রোগ সারাবে এই আশায়। তিনি সঙ্গে এনেছেন সঙ্গী ও সহকারী হিসাবে এক বীরেন রায়কে। বীরেন আস্তে আস্তে এই ক্ষুদ্র পরিবারের একজন সভ্য বলে গণ্য হল ; রান্নাবান্না, বাজার করা ইত্যাদি ব্যাপার তার হাতে চলে গেল।

একদিন হল কি, এই বীরেন রায় হঠাৎ মাথা মুড়ে ফেলল। আর তার দেখাদেখি মণি বলে বসল সেও মাথা মুড়োবে। মণির পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক, কেননা মণি ছিল সাজগোজে ফিটবাবু। বীরেন তাকে যত নিরস্ত করতে চেষ্টা করে, তত মণির জেদ বাড়ে।

এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখছেন :

"সেদিন কি তার পরের দিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বিকেলের দিকে রোজকার মত শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে আমরা বসেছি টেবিলের চারদিকে। হঠাৎ বীরেন উঠে দাঁড়াল, জোর গলায় বলে উঠল, 'জান আমি কে ? বললে বিশ্বাস করবে না, আমি স্পাই, ইংরেজ পুলিশের স্পাই—বুকের ভিতর চেপে রাখতে পারছি না, কথাটা বলতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে আপনার কাছে'—এই বলে শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে পড়ে গেল। আমরা তো স্তব্ধ বজ্রাহত। ভাবছি, এ কি সত্য না মিথ্যা—'মায়া নু মতিভ্রমো নু'। বীরেন আবার বলে উঠল, 'বিশ্বাস করছেন না ? এই দেখুন' বলে পাশের ঘরে ঢুকল, তার ট্রাঙ্ক খুলল, ভিতর থেকে বের করল একশ' টাকার নোট। 'দেখুন প্রমাণ—এত টাকার নোট আমি কোথায় পাব ? এ-টাকাটা আমার দুষ্কর্মের পুরস্কার···আর না, একাজ আর করব না—আজ আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, ক্ষমা চাইছি···।' আমাদের মুখে কোন কথা সরল না, সবাই নির্বাক নিস্পন্দ।

ব্যাপারটি ঘটেছিল এই রকমে। বীরেন মাথা মুণ্ডন করেছিল এই উদ্দেশ্যে যাতে স্পাইদল বুঝতে পারে যে আমাদের মধ্যে সে-ই তাদের লোক—ওই মুণ্ডিত মস্তকের চিহ্ন দিয়ে। কিন্তু মণির মাথাও মুণ্ডিত যখন দেখা গেল তখন তারা ধন্দে পড়ে গেল। আর বীরেনেরও সন্দেহ হল আমরা বা মণি হয়তো জানতে পেরেছি তার গোপন কথা এবং মণি ইচ্ছা করেই মুণ্ডিতমস্তক হয়েছে। তাই কতকটা ভয়ে, কতকটা আন্তরিক অনুশোচনায়—বেশির ভাগ নিশ্চয় আর কোন একটা শক্তির চাপে—এই স্বীকারোক্তি তাকে করতে হল।

এর পরে বাসার হাওয়াটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। আমরা গম্ভীর, চিন্তান্বিত—কি করে এমন জিনিস সম্ভব হল ? অন্দরমহলে শত্রুর প্রবেশ ? আর শত্রু আপন জন ? কি করতে হবে ? বিজয়ের মাথায় খুন চেপে গেল—তাকে থামানই মুস্কিল। যাহোক, বীরেন কিছু দিনের মধ্যে আপনা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল—আপদ শান্তি! শুনেছি পরে সে মহাযুদ্ধে যোগদান করে—মেসোপটেমিয়ায় যায় ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে।"*

এখানেই আমাদের গুপ্তচর কাহিনী শেষ করি।

---

* 'স্মৃতির পাতা'—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমায়ের আগমন

১৯১৪ সাল, ২৯শে মার্চ ৩·৩০ মিনিট

মা এলেন।

পৃথিবীর দিনপঞ্জীতে অবিস্মরণীয়, অভাবনীয় ঘটনা। ভারতের এবং ইউরোপের মিলন। এই দিনে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মায়ের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরবর্তী জীবনে বিরাট আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার সূত্রপাত।

মায়ের বয়স তখন ৩৭। প্রথম সাক্ষাৎ হলেও তিনি বহু বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দকে জানতেন তাঁর নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কল্যাণে। তোমাদের মনে আছে, পল রিশার মায়ের দূত হয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে যান। এইসব কারণে মা ফ্রান্স থেকে এলেন তাঁর সঙ্গে একত্রে আধ্যাত্মিক কর্মে যোগদান করতে।

এই প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নের উত্তরে মা বলেন :

"এগারো এবং তেরো বছরের মাঝে আমার অনেক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়। আমি জানলাম যে ভগবান আছেন : মানুষ তাঁর দেখা পেতে পারে এবং তার চেতনায়, কাজে তাঁকে প্রকাশ করতে পারে। রাত্রে ঘুমের সময় অনেক যোগী এসে আমায় এবিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং সাহায্য করতেন। এদের কয়েকজনের সঙ্গে পরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সাধনায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন যোগীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ল ; তাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডাকতাম। ক্রমশ আমার বোধ হল যে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার দেখা হবেই এবং তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে আমায় ভগবানের কাজ করতে হবে।···

যে মুহূর্তে আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম, আমি চিনতে পারলাম ইনিই সেই যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডাকতাম···এখন বুঝতে পারবে কেন আমি নিঃসংশয়ে জানি যে ভারতবর্ষে তাঁর পাশে আমার স্থান তাঁর সঙ্গে আমার কাজ।"

প্রথম দিনের সাক্ষাতের পর ৩০শে মার্চ মা তাঁর 'ধ্যান ও প্রার্থনা' বইতে লিখলেন :

"শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি, তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ করে যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে পরিণত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।"

'আর্য্য' পত্রিকা

'আর্য্য' পত্রিকার নাম আজকাল শোনা যায় না, শোনা যায় *Life Divine* (দিব্যজীবন) এবং শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য বড় বড় বইগুলির কথা ; কিন্তু 'সাবিত্রী' ছাড়া এইসব বই প্রথম প্রকাশিত হয় 'আর্য্য' পত্রিকায় এবং তাতে পণ্ডিতমহলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার খানিকটা তুলনা চলে 'ইন্দুপ্রকাশ'এ যুবক অরবিন্দের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পড়ে প্রৌঢ় কংগ্রেস কর্তাদের চাঞ্চল্যের সঙ্গে। অথবা, যখন 'বন্দেমাতরম্'এ শ্রীঅরবিন্দের লেখা অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করল, সেই উত্তেজনার সঙ্গে।

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আসেন ১৯১০ সালে। দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ তাঁর কোন ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছিল না। বাইরের জগৎ, তাঁর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ মনে করল, শ্রীঅরবিন্দ যোগী হয়ে মৌনীবাবা হয়ে গেছেন ; তিনি এখন "মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরি"। সেই চার বছরের ধ্যান-স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর 'আর্য্য' পত্রিকার মারফতে 'আগ্নেয়গিরি' আবার জ্বলে উঠল, তখন লোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেবল সাধারণ শিক্ষিত লোক নয়, যাঁদের বলা হয় দার্শনিক, পণ্ডিত, মনীষী তাঁদের মধ্যেও অনেকে শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দার্শনিক প্রবন্ধের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। এখনও অনেক দার্শনিক আছেন যাঁদের কাছে '*Life Divine*' একটা মস্ত হেঁয়ালি। যাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা তাঁদের আনন্দ, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পেলেন না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে শ্রীঅরবিন্দ 'আর্য্য' পত্রিকায় একই সঙ্গে চার পাঁচটা বই লিখতে শুরু করলেন, আলাদা আলাদা বিষয়ে। প্রত্যেক মাসে প্রায় ৬৪ পৃষ্ঠা তাঁকে লিখতে হত। ভেবে দেখ, কি করে একটা মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারে, যত বড় পণ্ডিতই হোন না ! একটা বই লেখাই কি দুরূহ ব্যাপার !

ব্যাপারটা এভাবে ঘটল। মা এবং পল রিশার যখন পণ্ডিচেরীতে এলেন, পল রিশার শ্রীঅরবিন্দের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে—তিনি নিজে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষী—শ্রীঅরবিন্দকে বললেন, "আসুন, আমরা একটা দার্শনিক পত্রিকা

বের করি। আপনার সামগ্রিক দৃষ্টি এবং অলৌকিক জ্ঞানসম্পদ সমস্ত বিশ্ববাসীকে বিতরণ করা উচিত কিন্তু এমনভাবে লিখতে হবে যাতে মানুষ মন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে।"

এই হল 'আর্য্য' পত্রিকার জন্মকাহিনী।

পত্রিকা প্রথম বের হল ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট, শ্রীঅরবিন্দের বেয়াল্লিশ বছরের জন্মদিনে। ছ'বছর ধরে একটানা কাগজ চলল। তাঁর প্রায় সমস্ত বড় বইগুলিই লেখা হয় এই কাগজে, প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠা। আর, যেটা জগতে পূর্বে কখনও ঘটেনি, পরেও ঘটবে কিনা সন্দেহ, তিনি একসঙ্গে পাঁচ-ছটা বই লিখে চললেন। কয়েক মাস পরে রিশার ও মা প্যারিসে চলে যান; শ্রীঅরবিন্দের স্কন্ধে তখন কাগজের বৈষয়িক ভারও পড়ল।

যে যে বিষয়ে বইগুলি লেখা তাদের নামগুলি অন্তত জেনে রাখ। ভবিষ্যতে তোমাদের যে বিষয়ে আকর্ষণ হবে, সে বিষয়ে পড়তে পারবে।

The Life Divine—মানবজাতির দিব্যজীবনের সম্ভাবনা;

Synthesis of Yoga—যোগ সম্বন্ধে তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা;

The Psychology of Social Development, এখন, The Human Cycle নামে প্রকাশিত—মানবসমাজের ক্রমোন্নতি;

The Ideal of Human Unity—সমস্ত মানবজাতির এক জাতি হবার সম্ভাবনা;

The Secret of the Vedas—বেদরহস্য;

The Future Poetry—ভবিষ্যৎ কাব্য;

The Foundations of Indian Culture—ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি;

The Isha Upanishad—ঈশোপনিষদ;

Essays on the Gita—গীতা প্রসঙ্গে প্রবন্ধসমূহ। আরও নানা ছোট বড় বই।

বিষয়গুলি কিরকম ভেবে দেখ। কত বিচিত্র—প্রত্যেকটি গ্রন্থ জ্ঞানের শেষ কথা। শুধু জ্ঞান নয়, সত্য; বুদ্ধির অতীত সত্য—আর কী ভাষা! যাকে বলা হয় পরাবাক্! কি করে এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি সম্ভব হল?

শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তর দিয়েছেন, বলেছেন যে যোগের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। ভেবে-চিন্তে লেখা নয়। তিনি বলেন, সমস্ত জ্ঞান, ভাব, ভাষা ঊর্ধ্বজগতে তৈরী থাকে; শান্ত, নীরব মনের মাঝে তারা নেমে আসে, কবিদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে থাকে। বিষয়টা

তোমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলেও এইটুকু ধারণা করতে পার যে তাঁকে যদি চিন্তা করে লিখতে হত—সাধারণত মানুষ যা করে—ছ'বছর কেন ষাট বছরেও তিনি এসব বই লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আর যা লিখেছেন, একেবারে চিরকালের সত্য। দুদিন পরে পুরনো হবে না বা মানুষ ভুলে যাবে না।

এই অমর গ্রন্থগুলি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে নূতন আলো, দেখাচ্ছে নূতন পথ, নূতন দিশা। ভবিষ্যতে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের সহজে তাদের অর্থ বুঝতে পারবে। শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর শিষ্যরা যেরকম বলতেন, "আপনার Life Divine মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"—তোমরা নিশ্চয়ই সেরকম বলবে না।

আর শ্রীঅরবিন্দও হেসে উত্তর দেবেন না, "Life Divine-এর এক দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদ পড়তে চেষ্টা কর। কিছুক্ষণ পরে ধ্যানে বসে যাও। দেবতারা কি আলো দেয় দেখ। হয়তো তারা তোমার সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করবে। করলই বা। মানুষ ঠেকে শেখে এবং ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়ে সাফল্যলাভ করে।"

১৯১৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথমবার মায়ের জন্মোৎসব পালন করা হল পণ্ডিচেরীতে। পরের দিন তিনি চলে গেলেন দেশে যুদ্ধ বেধেছে বলে। পণ্ডিচেরীতে থাকার সময় এই একবছর তিনি শ্রীঅরবিন্দের জন্যে রোজ কিছু মিষ্টি তৈরি করে আনতেন। শ্রীঅরবিন্দ সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর বাড়ি যেতেন সপ্তায় একদিন সন্ধ্যায় এবং সেখানে খেতেন। রাত নটা-দশটা পর্যন্ত কথাবার্তা চলত।

'আর্য' কাগজ যখন বের হল, মা-ই তার বৈষয়িক ব্যবস্থার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, গ্রাহকদের নাম-তালিকা হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ। আবার শ্রীঅরবিন্দের লেখা ইংরেজী থেকে ফরাসী অনুবাদ কার্যে তিনি পল রিশারকে সাহায্য করতেন। এঁরা যখন চলে গেলেন, শ্রীঅরবিন্দের কতখানি অসুবিধা হল ভেবে দেখ। তাঁকেই একা পত্রিকার জন্যে লেখাপড়া ছাড়া হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি ব্যবসার দিকটাও দেখতে হত।

১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালের মাঝে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মায়ের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। তাতে তাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, জীবনের একই উদ্দেশ্য ও ব্রত এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন পথে নানা কঠোর ও জটিল বাধা, পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী, এই দৃঢ় প্রত্যয়—এইগুলি তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল। আমরা তাতে দেখতে পাই, দুটি মহা-প্রাণ, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা, জগতের ও মানবজাতির মঙ্গলের জন্যে কিভাবে নিজেদের নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

শ্রীমায়ের পুনরাগমন

১৯২০ সাল

তীব্র সাধনা

১৯১৫ সাল থেকে—যে-বছর মা ফ্রান্সে চলে গেলেন, ১৯২০ সাল পর্যন্ত—মা যে-বছর ফিরে এলেন, শ্রীঅরবিন্দের কর্মসূচীর একটা মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া যায়।

প্রথমত বাইরের দিকে, তাঁর 'আর্য্য' পত্রিকা চালানোর কাজ; এবিষয়ে তোমাদের পূর্বে বলেছি। বাইরের গণ্যমান্য অথবা পূর্ব-পরিচিত লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ, সরস আলোচনা এবং তাদের দু'একজনকে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া—এগুলি কিন্তু তাঁর অবসরকালীন কাজ। বেশির ভাগ সময় তিনি সাধনায় মগ্ন থাকতেন অর্থাৎ একলা কাটাতেন ধ্যানে—তীব্র একাগ্র ধ্যানে। এসম্বন্ধে তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলা মুশকিল। তবে এইটুকু বলা যায় যে সেই ধ্যানের বা সাধনার একটি বাহ্যিক ফল হল তাঁর শরীরের আশ্চর্য পরিবর্তন।

একজন খ্যাতনামা বেদবেদান্তবিশারদ দর্শনার্থী—তিনি পরে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়ে আশ্রম-জীবন গ্রহণ করেন—লিখছেন, "ছয় বৎসর পরে ১৯২৩ সালে আমাকে আবার উপস্থিত করল তাঁর সামনে। ···দর্শনমাত্রই তাঁর চেহারা দেখে অতি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম:

"ভগবান! আর কি প্রমাণের প্রয়োজন! তখন আপনার রং ছিল গাঢ় বাদামি, এখন গৌরবর্ণ—আজকে আপনার চারদিকে সোনালি জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে···।"

শ্রীঅরবিন্দের সেবক ও শিষ্য আম্বালাল পুরাণী ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বার শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে এসে বিস্মিত হলেন। তিনি লিখলেন, "আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শন—দুই তিন বছরের তফাৎ। এর মধ্যে তাঁর দেহের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে, যাকে বলা চলে অলৌকিক। ১৯১৮ সালে তাঁর দেহের রং ছিল যে-কোন বাঙালীর মতো···যদিও মুখে জ্যোতি ছিল এবং দৃষ্টি ছিল অভ্রভেদী। উপরের তলায় উঠে তাঁকে দেখলাম, দুই গণ্ডে আপেলের মতো গোলাপি আভা আর সমস্ত দেহটা হঠাৎ গোলাপি-শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট জ্যোতিতে উজ্জ্বল। দৃশ্যটি এতই আশ্চর্যজনক ও অভাবনীয় মনে হল যে আমি চিৎকার করে উঠলাম "এ কী! কি দেখছি আমি!"

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারবে তাঁর সাধনা কী প্রবলভাবে এগিয়ে চলেছিল। মা আসার পর সেটা তীব্রতর হয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তাঁর সাধনা মা আসার অপেক্ষায় ছিল এবং মায়ের সাহায্যে তাঁর দশ বছরের সাধনা এক বছরের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করল।

মা এলেন ১৯২০ সালে ২৪শে এপ্রিলে। তিনি প্রথমে থাকতেন সমুদ্রের ধারে একটি বাড়িতে; পরে উঠে এলেন শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে Guest House বা Dortoir-এ এবং তখন থেকে একসঙ্গে রইলেন।

এটা কিভাবে ঘটল শোন:

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তরঙ্গদের নিয়ে প্রতি রবিবার রাত্রে মায়ের বাড়িতে যেতেন নিমন্ত্রণ খেতে। এই একটা দিন তাঁদের ভাগ্যে সুখাদ্য জুটত। "একদিন উঠল ঝড়বৃষ্টি তুফান। (পণ্ডিচেরীতে ওটা ছিল বাৎসরিক রেওয়াজ।) বাড়ীটি পুরোনো—প্রায় গলে যায় আর কি! শ্রীঅরবিন্দ বললেন, শ্রীমাকে ওখানে আর থাকতে দেওয়া চলতে পারে না—আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে শ্রীমা এলেন আমাদের কাছে, রয়ে গেলেন চিরকালের জন্য মা হয়ে।"*

মা আসার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের জীবনধারার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। মায়ের প্রথম কাজ হল শ্রীঅরবিন্দের ভার নেওয়া, তাঁর সেবাযত্ন করা। দ্বিতীয়, "মা এসে শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন যোগেশ্বররূপে। আমরা তাঁকে বন্ধু হিসাবে, মিত্র হিসাবে, সখা হিসাবে দেখেছি—মনে প্রাণে তিনি গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাও ঠিক; কিন্তু আচার-ব্যবহারে আমরা তাঁকে প্রায় আমাদের সমগোত্রীয় করে রেখেছিলাম।...শ্রীমা এসে শেখালেন তাঁর কথায় ব্যবহারে, কার্যতঃ দেখালেন শিষ্যভক্ত কাকে বলে—আপনি আচরি তিনি অপরে শেখান। শ্রীঅরবিন্দের সামনে বা সঙ্গে সমানে চেয়ারে না বসে, মাটিতে বসে তিনি দেখালেন গুরুকে কি রকমে সম্ভ্রম করতে হয়।...*

এই সময়ের দু'একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি। মা এসে গেছেন, শেষবার পাকাপাকিভাবে। সবাই তখন গেস্ট হাউসে।

"একদিন হল এক কাণ্ড। বাড়িতে ঢুকলেন এক সন্ন্যাসী—দেখবার মত চেহারা, সুদীর্ঘ, গৌরবর্ণ, কয়েক গোছা জটা আলম্বিত, মাথায় বিপুল পগ্‌গ।...তিনি

* স্মৃতির পাতা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ভিক্ষা করলেন। কিন্তু সে-দর্শন হয়ে গেল এক অলৌকিক ব্যাপার।" শ্রীঅরবিন্দকে জানান হল যে এই সন্ন্যাসী হলেন আসলে অমর চ্যাটার্জি যিনি শ্রীঅরবিন্দকে কলকাতা থেকে পণ্ডিচেরী জাহাজে তুলে দেন।

শ্রীঅরবিন্দ "সর্বনাশ!" বলে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে বিপ্লবের কাজ ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি রাজী হলেন এবং কলকাতায় ফিরে·গিয়ে আবার নিজের নাম গ্রহণ করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের 'সর্বনাশ' বলবার কারণ কি? অমর চ্যাটার্জি ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। তাঁকে ধরবার জন্যে সরকার মরিয়া হয়ে ওঠে, এমনকি তাঁর মাথার জন্যে মূল্যও বসায়। সেই বিপ্লবী নেতা যদি সশরীরে উপস্থিত হয় এবং পুলিস তা টের পায়, তাহলে অনুমান করতে পার শ্রীঅরবিন্দের অবস্থা। তাঁর পক্ষে কি তখন পণ্ডিচেরী থাকা সম্ভব হত?

এখন একটা ভূতের গল্প শোন। গল্প হলেও সত্য ঘটনা। শ্রীঅরবিন্দের 'পরিবারের' একটি মাদ্রাজী বাবুর্চি ছিল, নাম বত্‌তল্‌। তাকে কোন কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। সে তো চটে লাল, শাসিয়ে গেল, "আচ্ছা, দেখে নেব, তোমরা এবাড়িতে কি করে টিকে থাক।" এক মুসলমান ফকিরের কাছে গিয়ে সে ধরনা দিল, তার জন্যে কিছু করতে হবে। ফকিরটি জাদু জানত, যাকে বলে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'। জাদুর গুণে শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে পাথর পড়তে লাগল। বাকি অংশ সংক্ষেপে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলছি :

"দৃশ্য শুরু হল সাধারণভাবে দু'চারটা পাথর ফেলে। পড়ল আমাদের রান্নাঘরে, যেন সামনের ছাদ থেকে কেউ ছুড়ছে, অথচ কেউ নেই সেখানে। সন্ধ্যের সময় আরম্ভ হত, বাড়তে বাড়তে মাঝ রাত পর্যন্ত চলত। প্রথমে ছোট ছোট দু'চারটা পাথর, ক্রমশ বেশি ও বড় বড়, শেষের দিকে বোমা ফাটার শব্দ। এখন শুধু রান্নাঘরে নয়, প্রায় সর্বত্র। দুষ্টলোকের কারসাজি বলে আমরা পুলিসে খবর দিলাম। পুলিস তদন্ত করে কোন ফল তো পেলই না, পরন্তু যখন একটি ঢিল কনেস্টবলের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে সোঁ করে ছুটে গেল, পুলিস প্রাণের ভয়ে ইস্তফা দিল। এবার পাথরগুলি একেবারে বন্ধ ঘরের ভিতর পড়তে লাগল যাতে আমাদের কোন সন্দেহ না থাকে যে এটা ভুতুড়ে কাণ্ড। এরকম একটা পাথর আমি নিজে দেখেছি; মস্ত বড়, শূন্য দিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বসে পড়ল একটি বেতের চেয়ারে। এভাবে চলতে লাগল আক্রমণ। দেখা গেল যে পাথরগুলি মাটির একটু

উঁচুতে শূন্যে আকার নিত। মনে হত খুব কাছের থেকে আসছে, অথচ কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। এ পর্যন্ত ঢিল কারও গায়ে পড়েনি। এখন তাদের লক্ষ্য হল আমাদের একটি বোকা চাকর ; তাকে বিজয়ের ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখা হল, তবুও সে দারুণ জখম হল, রক্ত ঝরতে লাগল। পাথরগুলি সেই বন্ধ ঘরেই সৃষ্টি হয়ে আঘাত করল তাকে।

এ পর্যন্ত আমরা শুধু তামাশা দেখছিলাম। যখন খেলাটা সঙ্গিন হল, তখন ভাবলাম, আর তো চুপ করে থাকা যায় না। মা এসব ভুতুড়ে বিদ্যা জানতেন। তিনি বললেন যে ছোকরা চাকরটির উপর ওদের যত আক্রোশ। যেই আমরা তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম, সব একেবারে শান্ত! একটা পাথরও আর পড়ল না।"

কিছুদিন পরে বত্‌তলের বউ এসে মা ও শ্রীঅরবিন্দের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বত্‌তল 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' কিছু কিছু জানত। সে বুঝতে পেরেছে যে, যে-বিদ্যা এঁদের উপর সে প্রয়োগ করেছে, সেই বিদ্যা তাঁদের প্রবলতর শক্তির জোরে ব্যুম্যারাংএর মতো তাকে উলটো আঘাত করেছে। ফলে সে মরণাপন্ন।

শ্রীঅরবিন্দের তখন দয়া হল। তিনি বললেন, "এর জন্যে তার মরার প্রয়োজন নেই।"

তোমাদের বলছি যে মায়ের গেস্ট হাউসে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ছোট্ট সংসারের আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলে যায়। তাতে শ্রী, শৃঙ্খলা সংযম দেখা দিল। শ্রীঅরবিন্দ আর সখা বন্ধু নন, তিনি গুরু—মা এই ভাব জাগালেন সঙ্গীদের মধ্যে, এবং সাধনার দিকে তাদের আকৃষ্ট করলেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন পর্যন্ত কোন শিষ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর পুরনো দিনের সাথীদের নিয়ে তিনি বেশ সুখেই ছিলেন, কিন্তু মা এসে সেই ধারাটা বদলে দিলেন।

১৯২২ সালে তাঁরা কয়েকজন লাইব্রেরি হাউসে, বর্তমানে 'প্রসপারিটি'তে—চলে এলেন। মা এখন একটি সাধক-গোষ্ঠী তৈরি করলেন, তাঁদের সাধনা, খাওয়া-দাওয়া, থাকা-পড়া ইত্যাদির ভার নিলেন নিজের হাতে। ক্রমশ লোকজনও বাড়তে লাগল। বাঙালী ও গুজরাটীদের সংখ্যাই বেশি। কয়েকজন মহিলাও যোগ দিলেন। আপনা-আপনি যেন একটি আশ্রম গড়ে উঠল মা ও শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে। তবে 'আশ্রম' নামটা দেওয়া হল ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধির পর।

মা এখন ক্রমশ সামনে আসছেন আর শ্রীঅরবিন্দ সরে যাচ্ছেন পিছনে। মায়ের সঙ্গে সাধকদের যোগাযোগ বেড়ে উঠছে। শ্রীঅরবিন্দ 'সান্ধ্যবৈঠকে' আসছেন

বটে, কিন্তু সময়ের কোন ঠিক নেই। বিকেল চারটা থেকে রাত দশটায় গিয়ে দাঁড়াল। একদিন রাত ডুটোয় এলেন তিনি। বৈঠকে নানা গুরুগম্ভীর ও সরস আলোচনা হত; বাইরের লোকজনের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায়, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ—আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২৮ সালে ইউরোপ যাত্রার সময় পণ্ডিচেরীতে শান্তিলি জাহাজ থেকে নেমে রুগ্ণ শরীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে দেখে তিনি অভিভূত হন। শান্তিলি জাহাজে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কবি একটি প্রবন্ধ লেখেন (শান্তিলি জাহাজ, ২৯মে ১৯২৮)। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ হল এই :

"অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল··· প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত।··· অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার'।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার'।"*

এবার আবার আগের কথায় ফিরে যাই। ১৯২৬ সালের নভেম্বরের আরম্ভে সান্ধ্য আলাপ প্রায়ই সাধনা সম্বন্ধে হত। ঊর্ধ্বশক্তি অর্থাৎ ভাগবত চেতনাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব কিনা এটাই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই চেতনা নামলে মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব, অজ্ঞানতা অনেকাংশে কমে যাবে। এই সান্ধ্য আলাপ থেকে শিষ্যদের ধারণা হল যে একটা বড় শক্তি নামার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কেউ তার আভাসও পেল।

* 'প্রবাসী'। শ্রাবণ, ১৩৩৫

২৪শে নভেম্বর

অবশেষে সেই ঈপ্সিত দিন এল, মা যে-দিনের অপেক্ষায় ছিলেন বহু বছর ধরে। ঊর্ধ্বশক্তির চাপ ভয়ানক বেড়ে গেল নভেম্বরের শুরু থেকে। ২৪শে নভেম্বর চরমে উঠল। কিন্তু শিষ্যরা কেউ কল্পনা করতে পারেনি কী ঘটবে। বিকেলে তারা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, কেউ গেছে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। সূর্য অস্ত যায় যায়, এমন সময় মা খবর পাঠালেন, সবাই যেন যথাশীঘ্র লাইব্রেরি হাউসের বারান্দায় সমবেত হয়। পরিবেশ স্তব্ধ, ভক্তেরা মৌন, একাগ্র। কেউ কেউ দেখতে পেল, এক বিরাট আলোর বন্যা উপর থেকে নেমে এল ; মাথায় অনুভব করল এক দারুণ চাপ। তারপর কী ঘটল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষায় শোন :

"…আমি উঠেই দেখি অপরূপ দৃশ্য, শ্রীঅরবিন্দ চেয়ারে বসে আছেন, মা তাঁর পায়ের কাছে বসে—দুজনেই সামনে আমাদের দিকে মুখ করে।…আমরা সবাই বসলাম। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য ও পরিস্থিতি…শ্রীঅরবিন্দ একহাত—বাঁহাত—রেখেছেন মায়ের মাথার উপর, আর এক হাত—দক্ষিণ—বাড়িয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। সব নীরব স্তব্ধ গম্ভীর উন্মুখী। আমরা সবাই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে একে একে প্রণাম করে দাঁড়ালাম—একটু পরে তাঁরা ভিতরে চলে গেলেন।…

"এর পর থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ভিতরে চলে গেলেন—অর্থাৎ আর বাইরে এসে সান্ধ্য-বৈঠক করলেন না—এখন শ্রীমা প্রকট হলেন—আমাদের আদান-প্রদান মায়ের সঙ্গে শুরু হল।"*

আর একজন সাধক লিখছেন, "সাতটা বাজবার কয়েক মিনিট পরেই পর্দার পিছন দিকের দরজাটা খুলে দেখা দিলেন শ্রীমা আর শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহিমময় ভঙ্গিমায়, আর শ্রীমা তাঁর স্বাভাবিক রাজ্ঞীরূপে। শ্রীঅরবিন্দের পরনে ছিল রেশমের ধুতি আর চাদর, শ্রীমার পরনে রেশমী শাড়ী…।"

এই ২৪শে নভেম্বরকে বলা হয় সিদ্ধিদিবস। সিদ্ধিদিবস অর্থ কি, তার তাৎপর্য কি এবং কি ঘটল এই দিনে, তোমাদের তা জানবার কৌতূহল হবে। কিন্তু বললেও তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। তবুও শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া তাৎপর্য উল্লেখ করি। তিনি বলেছেন, "২৪শে নভেম্বর, ১৯২৬ সাল, হল দেহের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। তাঁর

---

* স্মৃতির পাতা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অবতরণের অর্থ হল অধিমানস (Overmind) দেবতার অবতরণ যা অতিমানস অবতরণের পথ তৈরি করবে।” আর অতিমানস অবতরণই হল শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ মানে তাঁর যে ভাগবত চেতনা সেই চেতনা শ্রীঅরবিন্দের দেহচেতনায়, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জড় দেহে, নামল। সহজ ভাষায় বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন দেহে, প্রাণে, মনে। তোমাদের মনে পড়বে, আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের বাসুদেব দর্শন। এখন তাঁকে পেলেন একেবারে দেহচেতনায়।

এর পরের ধাপ, অতিমানস নেমে পৃথিবীর রূপান্তর সাধন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ ভিতরে চলে গেলেন যাতে এই বিরাট অতিমানস শক্তি, আলো, জ্ঞান নামিয়ে আনার জন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

হয়তো বিশেষ কিছুই বুঝলে না। তবু মনে রেখো, এইদিনে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার নূতন যুগ আরম্ভ হল। ‘শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম’ প্রতিষ্ঠিত হল। মা হলেন আশ্রম-জননী।

শ্রীঅরবিন্দ অন্তরালে চলে যাবার পর মায়ের কাজ অনেক বেড়ে গেল। তিনি তখন রোজ ধ্যানে বসতেন সবাইকে নিয়ে, রাত্রে। ধ্যানে তিনি নানা দেবতাদের নামিয়ে আনতেন সাধকদের চেতনায়। ফলে, তাঁদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হত। কেউ কেউ অনুভব করত বিরাট শক্তি, কেউ অপরূপ জ্যোতি, কেউ কেউ মনে করত তারা এক-একজন দেবতা। এই যুগটাকে বলা হত আশ্রমের স্বর্ণ-যুগ। কিন্তু এই যুগ বেশিদিন স্থায়ী হল না। মা দেবতাদের নামিয়ে আনা বন্ধ করে দিয়ে সাধনাকে নামিয়ে আনলেন আরও নিচে, সাধারণ জীবনের মাঝে, নিম্নচেতনায়, অবচেতনায়।

যদিও শ্রীঅরবিন্দ নির্জনে থাকতেন, মা ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না, তবুও তিনি পৃথিবীর সমস্ত খবরাখবর রাখতেন, রোজ খবরের কাগজ পড়তেন। জাপানে চীনে কী হচ্ছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি ছোট বড় খবর সব জানতেন। যখন প্রয়োজন হত, যোগশক্তি ব্যবহার করে ঘটনার বা অবস্থার পরিবর্তন করতেন।

এসব ছাড়া, সাধকদের কাছে চিঠিপত্র লিখে তিনি তাঁদের সাধনার কাজে মাকে সাহায্য করতেন। এই সময় একটা নিয়ম করা হল যে, সব সাধক-সাধিকা তাঁদের সাধনার, শরীরের ও মনের অবস্থার কথা মাকে বা শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখে জানাবেন।

তাহলে বুঝতে পারছ, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যোগীর কতখানি তফাৎ। অন্যান্য যোগীসন্ন্যাসীরা সংসারের কোনো ধারই ধারেন না।

চিঠি লেখার ধুম পড়ে গেল। প্রায় সকলেই তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা, সাধনার বাধা, শরীরের ও মনের কষ্ট ইত্যাদি জানাতেন আর শ্রীঅরবিন্দ সেসব চিঠি মাকে পড়ে শোনাতেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেককে উত্তর এবং সাধনার নির্দেশ দিতেন। একজন সাধক সাত-আট বছরের মধ্যে প্রায় তিন হাজার চিঠি পান শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে। সারা রাত জেগে তিনি এসব চিঠির উত্তর লিখতেন; দিনে প্রায় আট ন' ঘণ্টা ব্যয় হত এসব চিঠি লিখতে। একজন সাধক তাঁর চিঠির উত্তর পেতে একটু দেরি হওয়াতে নালিশ জানালেন। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন :

"তুমি ধারণা করতে পারছ না যে আমাকে বারো ঘণ্টা ব্যয় করতে হয় সাধারণ চিঠিপত্রের ব্যাপারে, (আশ্রমের) নানা ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্ট পড়তে। বিকেলে তিন ঘণ্টা আর সারা রাত কেটে যায় এই কাজে।"

তাহলে দেখ, তাঁর নির্জন বাস মোটেই আরাম-উপভোগ করবার জন্যে নয়।

বছরে তিনবার, পরে চারবার সবাইকে মা-শ্রীঅরবিন্দ উভয়ে একসঙ্গে দেখা দিতেন। একে বলা হত 'দর্শন'। শ্রীঅরবিন্দকে যখন জিজ্ঞেস করা হল কেন তিনি বাইরের সম্পর্ক ত্যাগ করে নির্জন বাসে চলে গেলেন, তিনি বললেন "একটা বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে তার দরকার হয়। মা যে-সব কাজ করছেন, আমাকেও যদি তা করতে হত, তাহলে আমার 'সত্যিকারের যে কাজ' তার জন্যে সময় পেতাম না।"

দর্শন

এই 'দর্শন' কি জিনিস তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। দু'এক মিনিটের ব্যাপার। তবু শ্রীঅরবিন্দকে দেখবার জন্যে সাধকেরা দিনের পর দিন গুনত, বহু দূর থেকে দর্শনার্থী আসত, কিন্তু তার জন্যে মায়ের অনুমতির প্রয়োজন হত।

কেন তাদের এত ব্যাকুলতা? শুধু একটি মহাপুরুষকে চোখে দেখবার ইচ্ছা, যেমন আমরা দেখেছি মহাত্মা গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথকে? তা নয়! শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এই দর্শনের দিনগুলিতে উপর থেকে প্রচণ্ড শক্তি নামে। মা ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সেই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকট হয়। সাধক ও দর্শনার্থীদের অনেকে সেই অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখতে পায়। কেউ দেখে শিব ও শক্তির রূপ, কেউ শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অথবা বিরাট জ্যোতি ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করে। একজন আমেরিকাবাসী দর্শনার্থী দেখে তার দেশের সমস্ত মানুষ মা ও শ্রীঅরবিন্দের পায়ে প্রণত।

এই এক মিনিটের দর্শন কতজনের জীবনে নিয়ে আসে অভাবনীয় পরিবর্তন। সাধকদের সাধনায় উন্নতির পথে প্রত্যেকটি দর্শন হল এক-একটি ধাপ। যারা একবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছে, কথাবার্তা নয়, শুধু নীরবে চোখে দেখা এবং এক মিনিটের জন্যে, তারা জীবনে সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেনি। সামনে বসে আছেন তিনি ; খালি গা, উত্তরীয়ের মতো একখানা চাদর গায়ের উপরে। মা ডান পাশে বসে, শাড়ী পরা, মাথায় মুকুট, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। আর শ্রীঅরবিন্দ গম্ভীর, ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা।

অপরূপ ছবি—দেবাদিদেব শিব আর জগজ্জননী পার্বতী ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের কাজ ও যোগ

এখন তোমরা জানতে চাইবে, শ্রীঅরবিন্দের আসল কাজটা কি ? প্রশ্ন সহজ, কিন্তু উত্তর বেশ কঠিন। কারণ, এটা বুঝতে হলে তাঁর যোগ সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা চাই। মনে রাখবে যে তিনি সর্বাগ্রে যোগী। যোগ কথাটা শুনলে অনেকে আঁতকে ওঠে। কিন্তু এমন দিন আসছে যখন বিষয়টা যোগবিয়োগের মতো সহজ হয়ে যাবে। কথাটার সাদা অর্থ হল মিলন, এক হওয়া। গভীর অর্থে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের আত্মার মিলন। ভগবানের দেখা পাওয়া, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা, এটাই হল আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। কি উপায়ে তা সম্ভব ? পথ, উপায় অনেক কিন্তু সকল পথেরই মূল কথা হচ্ছে, যোগীরা বলেন, আমাদের ভিতরে আত্মা ও অন্যান্য শক্তিসমূহ ঘুমিয়ে রয়েছে, বীজের মাঝে গাছের মতো। আত্মা হল ভগবানের অংশ। গুরুর সান্নিধ্যে, নির্দেশে, সর্বোপরি তাঁর শক্তিতে এই সুপ্ত আত্মা ও শক্তিসমূহ জেগে ওঠে ও ক্রমশ বিকশিত হয়। তাদের বিকাশের ফলে এবং গুরুর কৃপায় একদিন ভগবান লাভ হয়। অল্প কথায় একেই বলে যোগ।

অন্যান্য যোগের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগের তফাৎ হল এই যে, তাদের অভিজ্ঞতায় সংসার হল মিথ্যা, মায়ার সৃষ্টি, দুঃখময়, সুতরাং সংসারকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এটা আংশিক সত্য। উচ্চতর উপলব্ধিতে দেখা যায় যে জগৎই শুধু ভগবানের সৃষ্টি নয়, জগতের সব কিছুই ভগবানময়, সর্বম্ ইদম্ ব্রহ্ম। কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না, অজ্ঞানের মধ্যে বাস করি বলে ; অজ্ঞান থেকে আসে দুঃখ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। যোগের ফলে এই অজ্ঞানের পর্দাটা সরে যায়। তখন আমরা নিজেদের আত্মাকে জানি—ঋষিরা বলেন, 'আত্মানং বিদ্ধি', অর্থাৎ আত্মাকে জানো—আর তার ফলে আমরা সর্বত্র ভগবানকে দেখি। সংসার তখন আর মিথ্যা, মায়া মনে হয় না। দুঃখশোকের মধ্যেও ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। কাজেই সংসার ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে না। বরং শ্রীঅরবিন্দের যোগের বিশেষত্ব হল, এই সংসারকে গ্রহণ করা, তাকে পরিবর্তিত করা।

ভগবানের সঙ্গে মিলন হল তার প্রথম ধাপ। শেষ ধাপ হল, ভগবানের সর্বোচ্চ শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি এই জগতে নামিয়ে আনা যার ফলে আমাদের জীবন আমূল বদলে যাবে; আস্তে আস্তে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে দিব্য জীবন। আমাদের মর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গরাজ্য, Kingdom of God—এই স্বপ্ন বহু মহাপুরুষ, কবি, যোগী, ঋষি আগে দেখেছেন, কিন্তু তাকে ফলিয়ে তুলতে চেষ্টা করেননি। শ্রীঅরবিন্দই এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন। শুধু তাই নয়, এই কাজ সম্পন্ন করার জন্যই মা ও শ্রীঅরবিন্দ এই জগতে নেমে এলেন।

এটা কি করে সম্ভব হবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তিনি এমন এক ভাগবত শক্তির সন্ধান পেয়েছেন যাকে নামিয়ে আনতে পারলে এটা সম্ভব হবে। এই শক্তি হল অতি-মানস শক্তি। আমাদের বিজ্ঞান বলে যে সৃষ্টির একটা ক্রমবিকাশ আছে। তার ধাপ-গুলি হল জড়জগৎ, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ। মানুষই শেষ সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মানুষের পরেও ধাপ আছে, সেটা হল অতিমানুষ বা দেবজাতি। যেহেতু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে চাই একান্ত একাগ্র তপস্যা—তাই তিনি মাকে আশ্রমের ভার দিয়ে সাময়িকভাবে আড়ালে চলে গেলেন।

এই হল তাঁর আসল কাজ।

১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি একেবারে নির্জনে ছিলেন; কেবল মায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর কথাবার্তা, দেখাশোনা। বারো বছর উপরের তলায় তাঁর ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সাধনা দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সিদ্ধি প্রায় হাতের মুঠোয়; তখন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ১৯৩৮ সালে নভেম্বর দর্শনের আগের রাতে তিনি পা ফসকে পড়ে গেলেন তাঁর ঘরের মেঝেতে। ডান পায়ে ভয়ানক চোট লাগল, হাড় ভেঙে গেল। ডাক্তারদের ডাক পড়ল। প্রায় তিন মাস তাঁকে শুয়ে থাকতে হল। ভেঙে গেল তাঁর নির্জন বাস। দীর্ঘ বারো বছর ধরে তাঁর কয়েকজন শিষ্য তাঁর সেবা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ডাক্তার-শিষ্য শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্র বাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সারাংশটুকু তোমাদের বলছি। তিনি লিখছেন:

"কোনদিন ভাবতে পারিনি যে ইহজীবনে দেখাসাক্ষাৎ হবে তাঁর সঙ্গে। তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় তাঁর চিঠির মারফতে আমরা পেয়েছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয়, তাঁর বাইরের জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল পরিচয় পাবার সৌভাগ্য, এর তুলনা নেই। প্রথমেই দেখলাম, মুহূর্ত মাত্র, তাঁর সুবর্ণ দেহ, বেদের ভাষায় হিরণ্ময় পুরুষ, তারপরে

আশ্চর্য লাগল যে এত গুরুতর জখমেও বিন্দুমাত্র আঃ-উঃ করলেন না। কী সহ্যগুণ! দেখলাম তাঁর খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার, শুনলাম তাঁর কথাবার্তা, শিখলাম ছোট-বড় কত জিনিস। আরও দেখলাম একসঙ্গে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের মর্তলীলা, শিব আর শক্তির।

চোখে পড়ল তাঁর চেহারা। কী সুন্দর, শান্ত কমনীয় অথচ অপূর্ব মহিমময়! দেবকল্প মহাপুরুষ, অথচ মনে হয় কত আপন! স্বতই মনে পড়ে দেবতার মাঝে শিবের কথা। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; খাওয়া-দাওয়ায় আসক্তিহীন; ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগরমে অ-কাতর। শাক দিলে তাতেই তুষ্ট, আবার সন্দেশেও আপত্তি নেই। নিন্দা-প্রশংসা, মান-অপমানে নির্বিচল ও নির্বিকার। রাগ নেই, হিংসা নেই। বারো বছর ধরে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছি, একটা কটু কথা শুনিনি, সামান্য ত্রুটি দেখিনি। বিশেষ অসুবিধাবশত প্রায় চার-পাঁচ বছর স্নান করতে পারেননি, শুধু গা মুছে দেওয়া হত; অথচ দুর্ঘটনার আগে রোজ স্নান করতেন। গরমকালে, যখন বিছানায় বসে লিখছেন, সারা শরীর ঘর্মাক্ত, বিছানা পর্যন্ত ভিজে গেছে। কোন খেয়াল নেই, লিখেই চলেছেন। মা এসে দাঁড়ালেন পাশে এক গেলাস ডাবের জল নিয়ে; জানতেই পারছেন না, এমন মনোযোগ।

এই তো আমাদের চিরকালের শিবের ছবি, শান্তিময় শিব—নির্বিকার, নির্বিচল, উদাসীন অথচ করুণাময়।

উদাসীন নিজের বেলায়, কিন্তু জগতের, মানুষের বেলায় কী করুণা, কী প্রেম! বুদ্ধের মেত্তা, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার উজ্জ্বল জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শিষ্যদের এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গল সাধনে তিনি ও মা অহোরাত্র ব্যস্ত। ক্ষুদ্র সাধারণ উদাহরণের মাঝে দেখতে পেলাম শিষ্যদের কোথায় কার অসুখ, কার কি অভাব, কে বিপদে পড়েছে—এই যে হাজার রকমের চিন্তা, ধান্ধা, দুঃখকষ্ট, অভাব-অভিযোগের কাহিনী ক্রমাগত তাঁদের কাছে আসছে, চিঠিতে, মুখের কথায়, এবং তার উত্তর যাচ্ছে চিঠিতে, কথায় আর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে। বড় দৃষ্টান্ত, গত যুদ্ধ। দানব হিটলার মানব-সভ্যতা ধ্বংস করতে তার খড়্গ তুলেছে, বিশ্ববাসী ভয়ে কম্পমান, দিশেহারা। দুর্গা যেভাবে মহিষাসুর বধ করে মর্তে শান্তি নিয়ে এলেন, তেমনি মা-শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে হিটলার অসুরকে বিনাশ করে পৃথিবীতে নিয়ে এলেন ভগবানের আশীর্বাদ।

তারপর, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত। আজ যে আমরা স্বাধীন, তার মূলে কার শক্তি কাজ করেছে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, এই ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর মুখ থেকে শুনতে

পাই ১৯৩৫ সালে, মা বলেছেন ১৯২৪ সালে বোধহয়, যখন একথা কেউ ভাবতেও পারেনি। গত যুদ্ধে জাপান তার সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধজাহাজ, এরোপ্লেন নিয়ে হানা দিয়েছে, কলকাতায় বোমা পড়ছে, ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ, পালিয়ে যাচ্ছে দেশের লোক। অনেকে খুশি, জাপান আমাদের স্বাধীন করবে। এই সঙ্কট মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের পাঞ্চজন্য বেজে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে জাপান চা-পান খাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না ; তল্‌পি-তল্‌পা বেঁধে আসামের আঁধার জঙ্গল ছেড়ে 'সূর্যের দেশে' পালিয়ে গেল।

আমরা শ্রীঅরবিন্দের ঘর থেকে এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা দেখলাম। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। এই স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন বাল্যকালে। তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন যৌবনকালে, যুদ্ধ করে চলেছেন প্রৌঢ়বয়সে, পরে পণ্ডিচেরীতে এসে তাঁর অব্যর্থ যোগশক্তি দিয়ে। তাঁর জন্মদিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, এই তো ভগবানের আশীর্বাদ-স্বীকৃতি।"

এ সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা বলছি। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরকম : ১৯৪৭ সাল। দিল্লীতে একটা বিরাট হলঘরে সাংবাদিকের দল এসে মিলিত হয়েছে। হঠাৎ একজন ভারতীয় সাংবাদিক তখনকার বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটনকে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, যদি ভারতবর্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয় একটি দিন স্থির করেছেন ?"

"নিশ্চয়।"

"কোনদিন জানতে পারি কি ?"

মাউণ্টবেটন বিরাট হলের জনতার দিকে তাকালেন এবং আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমতার শেষ হস্তান্তর হবে ১৫ই আগস্টে।'

অকস্মাৎ যেন একটা বোমা ফাটল। বিলাতের পার্লামেণ্টে, ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে সবাই শুনে স্তম্ভিত হল, তারা কেউ এত দ্রুত তাদের সাম্রাজ্য হারাবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় নেতারা তো ঘুণাক্ষরেও এর আভাস পায়নি। এটা মাউণ্টবেটনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এই তারিখে নাকি জাপান-সাম্রাজ্য বর্মাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিনাশর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ; তাঁর বিজয়কীর্তি অমর রাখবার উদ্দেশ্যে তিনি এই তারিখটি নির্বাচন করেন। তাঁর কীর্তিগাথা হয়তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে, কিন্তু অপরপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার জন্ম চিরতরে লোকের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের সঙ্গে। এমন সময় আসবে যখন সমস্ত ভারতবাসী দুটি অবিস্মরণীয় দিন একসঙ্গে পালন

করবে মহাসমারোহে।

ভারতের স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে শ্রীঅরবিন্দ যে অপূর্ব বাণী দেন তার কিছু অংশ শোন :

"১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এই দিনে ভারতবর্ষের এক নূতন যুগ আরম্ভ হল ; বিদায় নিল পুরাতন যুগ। সারা জগতের পক্ষে, মানবজাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের পক্ষেও নূতন যুগের সূচনা হল এই দিনে। আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের জীবন ও কর্মের দ্বারা এই দিনটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করতে পারি।

১৫ই আগস্ট আমারও জন্মদিন। এই দিনটি যে এত বড় গুরুত্ব পেল, এটা আমার পক্ষে অবশ্য আনন্দের বিষয়···। বাস্তবিক যে-সমস্ত বিশ্ব-আন্দোলন আমার জীবিতকালে সফল হবে বলে আশা করেছিলাম, আমি এই দিনে দেখতে পাচ্ছি সেগুলি সফল হতে আর দেরি নেই, যদিও এক সময় তাদের অলীক স্বপ্ন বলে মনে হত। এই সমস্ত আন্দোলনে স্বাধীন ভারতও একটি বৃহৎ অংশ, এমনকি নেতার স্থানও নিতে পারে।"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কতকগুলি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। সংক্ষেপে শোন :

প্রথম স্বপ্ন হল, ভারত স্বাধীন হবে। স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু সে আজ খণ্ডিত। সেই পুরোনো হিন্দু-মুসলমান দলাদলি। এই বিভাগ যেতেই হবে, ভারতকে এক হতেই হবে। ভবিষ্যতে মহাজাতি হতে হলে এটা তার পক্ষে অনিবার্য। (শ্রীঅরবিন্দের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে অতি আশ্চর্যরূপে)।

দ্বিতীয় স্বপ্ন : সমস্ত এশিয়াবাসী আবার স্বাধীন হবে ও জেগে উঠবে। পূর্বের মতো তারা মানবজাতির উন্নতিকল্পে সাহায্য করবে। এই জাগরণে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে এবং তা করছে। (এই ভবিষ্যৎ-বাণীও সফল হচ্ছে)।

তৃতীয় স্বপ্ন : সমস্ত মানবজাতি এক হবে, গড়ে তুলবে একটি উজ্জ্বল মহৎ জীবন। সে স্বপ্ন সফল হবার পথে। এখানেও ভারত প্রধান অংশ নিচ্ছে।

চতুর্থ স্বপ্ন : ভারতের যে নিজস্ব ধর্ম আধ্যাত্মিকতা, তার উপলব্ধির জন্যে আত্মার বাণী শোনবার জন্যে মানুষ ক্রমশ ভারতের দিকে ফিরবে। ফলত তাই ঘটছে।

শেষ স্বপ্ন হল : মানুষকে বিশালতর উচ্চতর চেতনায় উঠতে হবে। এই প্রেরণাও আসবে ভারতবর্ষ থেকে এবং ভারতই নেবে তার ভার।

এই স্বপ্নগুলি যদি বিচার কর, দেখবে ভারতের মঙ্গল চিন্তা ও ভবিষ্যৎ কতখানি

তাঁর চেতনা জুড়ে ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের অমর বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে যে শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশ-প্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী, মানবজাতির প্রেমিক।

আমি শ্রীঅরবিন্দের করুণার সর্বোত্তম দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলাম না, তাঁর 'আসল কাজ'-এর প্রসঙ্গে তা করেছি বলে। তিনি বলেছেন, "আমার নিজের কোন অভাব নেই, কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আমি কিছুই চাই না। কেবল এই দুঃখ-শোক-জরা-মরণকবলগ্রস্ত মনুষ্যজগতে আনতে চাই চিরশান্তি, আনন্দ। চাই মানুষের, পৃথিবীর রূপান্তর।"

আর একটা অপ্রত্যাশিত খবর পেলাম, ডাক্তার-শিষ্যের বইতে, সেটা হল শ্রীঅরবিন্দের হাস্য-কৌতুক। শিব তাঁর 'প্রমথ'দের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে তাদের আনন্দ দিচ্ছেন। হাস্যরসেও তিনি অদ্বিতীয়।

তোমাদের এখন জানতে কৌতূহল হবে, যোগশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি কাকে বলে; সেই শক্তি দিয়ে কি করেই বা শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বযুদ্ধে কিংবা ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য করলেন। বিষয়টা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আমরা এভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। আমরা যদি মানি যে ভগবান বলে কেউ আছেন, যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ একথাও মানতে হবে। এখন আমি যদি যোগসাধনার বলে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, তাহলে তাঁর অসীম শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারি এবং সেই শক্তি ব্যক্তিগত বা জগতের কাজে প্রয়োগ করতে পারি, বিজ্ঞানীরা যেমন ব্যবহার করেন বিদ্যুৎ-শক্তি বা আণবিক শক্তি। বস্তুত বহু যোগী এই আধ্যাত্মিক সক্রিয় শক্তির অধিকারী এবং সেই শক্তি আমাদের বৈজ্ঞানিক শক্তির চেয়ে ঢের বেশি জোরালো ও কার্যকরী। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তি লাভ করে অবিরত ব্যবহার করেছেন ছোট বড় সমস্ত বিষয়ে, নানা ক্ষেত্রে, বিশ্বের মানবের কল্যাণে।

কাব্যগ্রন্থ

এখন আমরা কবি শ্রীঅরবিন্দের কিছু পরিচয় নেব। তিনি এককালে বলতেন, "আমি আগে ছিলাম কবি ও রাজনীতিবিদ্, যোগী বা দার্শনিক নয়।" অথচ শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁকে যোগী বলেই জানে। তাঁর উক্তি অনুসারে তিনি যোগী হলেন পরে, কবি ছিলেন ছোটবেলা থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত। যখন রাজনৈতিক কাজে দারুণ ব্যস্ত, তখনও তাঁর কবিতা রচনা থামেনি। একটু অবসর পেয়েছেন তো তখনই কবিতালক্ষ্মীকে

তিনি স্মরণ করেছেন। এতেই বোঝা যায়, তিনি জন্মকবি এবং কবিতা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এমনও বলেছেন যে কবিতা এবং শিল্পকলাই একদিন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে। তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্যে সেই নিদর্শনই পাই।

লেখক হিসাবে একদিকে তাঁর অমর দার্শনিক গ্রন্থ *The Life Divine* (দিব্যজীবন), কবি হিসাবে অন্যদিকে তাঁর অমর মহাকাব্য *Savitri* (সাবিত্রী)। দুটির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করেছে তাঁর যোগসাধনা। অর্থাৎ তাঁর যোগলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই রূপ নিল *Life Divine* গ্রন্থে আর 'সাবিত্রী' কাব্যে।

এখন তাঁর অন্যান্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলি। বিষয়টা খুব সহজ নয়, কেননা তিনি হলেন ইংরেজ কবি। ইংরেজী কবিতার সমঝদার হওয়া আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন। যারা বোঝে তারা বলে, শ্রীঅরবিন্দের সব কবিতায় পাওয়া যায় তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পীমনের পরিচয়, ধ্বনি-সমন্বয়, চিত্র-বিন্যাস, সুন্দর বাক্যচয়ন অর্থাৎ সমস্ত শিল্পগুণের সমাবেশ যা ভবিষ্যতে মহৎ কাব্য সৃষ্টি করে। তাছাড়া রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি যা কবিতায় আনে গভীরতা। তাঁর প্রথম বয়সের লেখা কবিতাগুলি ভারি সুন্দর, গ্রীকভাবাপন্ন, কারুকার্য নিখুঁত। বরোদাবাসের সময় লিখলেন লম্বা কবিতা ও নাটক, *Love and Death* (প্রেম ও মৃত্যু), *Urvashie* (উর্বশী), 'সাবিত্রী'র প্রথম খসড়া। রাজনৈতিক যুগে লিখলেন অনেক কবিতা, নাটক, সবগুলি প্রায় স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপক। *Baji Prabhou* (বাজীপ্রভু) হল এই স্বদেশ-প্রেমের কথা ; বীররসের অপূর্ব কাহিনী। বাজীপ্রভুর কী দুর্জয় সাহস, মহৎ আত্মত্যাগ, মা ভবানীর উপর জ্বলন্ত বিশ্বাস। অবশ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা হল তাঁর পণ্ডিচেরী-যুগে। তাঁর দার্শনিক রচনা সম্বন্ধে যেমন তিনি বলেছেন যে সমস্ত বই তাঁর যোগের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান থেকে লেখা, তেমনি তাঁর কবিতা ; তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা যত গভীর হতে লাগল, কবিতাশক্তিও তত বাড়তে লাগল। কত রকমের কবিতা যে লিখেছেন—লিরিক, সনেট, নূতন ছন্দে লেখা এপিক, লিরিক, ইত্যাদি ! এ ছাড়া আবার নাটকও ! এমন সর্বতোমুখী প্রতিভা বেশি চোখে পড়ে না। যোগই বল, কাব্যই বল, রাজনীতিক নেতাই বল—সব কিছুতেই তিনি অদ্বিতীয়, সব্যসাচী। পল রিশার বলেন, শ্রীঅরবিন্দ যে-কোন পেশাই নিতেন না কেন, তাতেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান লাভ করতেন।

শুধু কি তাই ? তাঁর যোগশক্তি-বলে তিনি আবার শিষ্যদের মাঝে কবির সৃষ্টি করেছেন। প্রবাদ আছে যে কবি জন্মায়, চেষ্টা করে কবি হওয়া যায় না ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ

আশ্রমে যেমন যোগী, তেমনি কবি ও শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছে।

এবার শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব সৃষ্টি 'সাবিত্রী' কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলে তাঁর কবিগুণগান শেষ করি। আজ যদিও অনেকে এর কথা জানে না, এমনকি কেউ কেউ একে কাব্য বলে স্বীকার করে না, কিন্তু এদিন থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে রামায়ণ-মহাভারতের মতো এই কাব্যও ঘরে ঘরে বিরাজ করবে। এই কাব্যকে অস্বীকার করার প্রধান কারণ হচ্ছে, এর বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক, মিস্টিক। লোকে চায় সাধারণ প্রেমের, সুখ-দুঃখের কাহিনী, অন্ততপক্ষে মন-বুদ্ধি দিয়ে যা সবাই বুঝতে পারে।

যাই হোক, ২৩৮০০ লাইনের এই মহাকাব্য রচনায় মহাকবি যেন তাঁর সমস্ত প্রাণ ও প্রতিভা ঢেলে দিয়েছেন। কত বছর ধরে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে লিখেছেন, সময়ের অভাবে ফেলে রেখেছেন। অদলবদল করেছেন অফুরন্ত। শেষে, যখন স্থির করলেন যে তিনি দেহত্যাগ করবেন, তাড়াতাড়ি এই মহাকাব্য শেষ করলেন।

বিষয়বস্তুটা কি ? বলা যেতে পারে, মহাভারতের সাবিত্রী উপাখ্যান অবলম্বন করে তিনি তাকে দিলেন গভীরতর, বিশালতর আধ্যাত্মিক অর্থ। তাই তিনি বলেছেন, সাবিত্রী হল পুরাণ কাহিনী এবং প্রতীক। সত্যবান হলেন মানবাত্মার প্রতীক, তিনি নেমে এসেছেন এই পৃথিবীর অজ্ঞান মৃত্যুর রাজ্যে। সাবিত্রী, যিনি জগন্মাতা, তিনিও জন্ম নিলেন, তাঁর কল্পনাতীত যোগশক্তির বলে সত্যবানকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আঁধারের, অজ্ঞানের, মৃত্যুর পরাজয় হল ; জগতে আলো, সত্য ও আনন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই হল চুম্বকে 'সাবিত্রী' কাব্য, শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন, আসল কাজ।

কিন্তু কী ভাষা! এই ভাষা পৃথিবীর কোন কবি সৃষ্টি করতে পারেননি : এর সঙ্গে মিলেছে তাঁর ঋষি-দৃষ্টি, অলৌকিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভবিষ্যতের কাব্য হবে মন্ত্র, বেদে উপনিষদে যার স্বাক্ষর পাই। সাবিত্রী সেই মন্ত্র। শ্রীমায়ের বাণীতে 'সাবিত্রী' হল শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরম মন্ত্র-গাথা। বলতে পার, মানবজাতির দেবোজ্জ্বল সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ-বাণী। এই কাব্যে পরিচয় পাবে তিনি মানুষকে কতখানি ভালবাসতেন। বস্তুতঃ তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থেই আমরা পাই মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা!

আশ্চর্যের বিষয়, 'সাবিত্রী' কাব্যও শেষ হল, তাঁর দেহলীলারও অবসান হল ; তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। যোগীর ভাষায়, এ হল ইচ্ছামৃত্যু। কিন্তু কারণ কি বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মা বলেছেন, "দেহত্যাগ তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল না ; কিন্তু

যে কারণে করেছেন তা এত মহৎ যে মানুষের বুদ্ধি তা বুঝবে না।"

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর রাত্রি ১-২৬ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন আর ভোরে দেখা গেল যে তাঁর সারা দেহ সোনালি রঙে উজ্জ্বল। মহিমামণ্ডিত সেই দেহ শক্তি, শান্তি ও আনন্দে উদ্ভাসিত। সবাই অবাক, মুগ্ধ, অভিভূত! এই স্বর্ণাভা পাঁচদিন ধরে অত্যুজ্জ্বল থাকে এবং শত শত লোক দেখতে পায়। মৃতদেহ সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার পরে বিবর্ণ হয়, বিকৃত হয়, কিন্তু পাঁচদিন অবধি শ্রীঅরবিন্দের দেহে কোন বিকৃতি দেখা দেয়নি। ডিসেম্বরের ৯ই তারিখে এই অলৌকিক আভা মিলিয়ে যেতে থাকে এবং সন্ধ্যা ৫টায় দেহ সমাধিস্থ করা হয় আশ্রমের উঠানে একটি গাছের শীতল ছায়ায়।

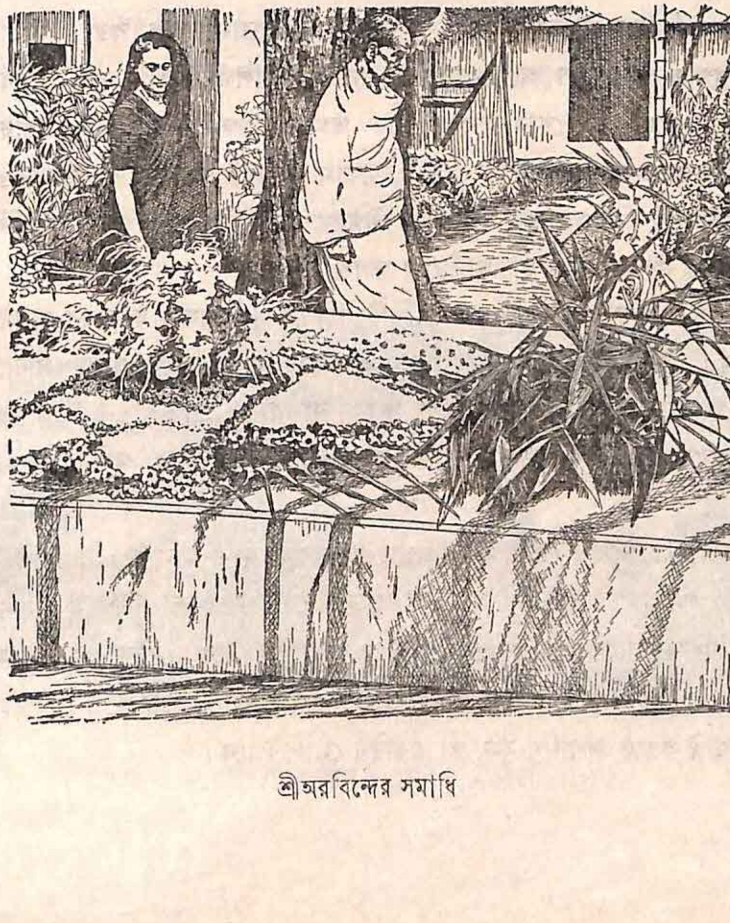
চতুর্দশ অধ্যায়

উপসংহার

নূতন যুগের সূচনা

হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আজ শ্রীঅরবিন্দের সমাধির স্পর্শ নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দের দেহ-ধারণকালে যা সম্ভব হয়নি, দেহাবসানে তা ঘটল। সাধারণ লোক যেন তাঁর নাগাল পাচ্ছে। সমাধি স্পর্শে নিয়ে যাচ্ছে আলো, শান্তি, আশা। দেশবিদেশের লোক, অদ্ভুত পোশাক পরা সাহেব-মেম ভক্তিভরে প্রণাম করে, গাছের তলায় বসে চুপচাপ ধ্যান করে। পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও তিনি রয়েছেন এই পৃথিবীর হাওয়ায়, জলে, মাটিতে মিশে। এই প্রসঙ্গে মা যা বলেছেন শোন :

"প্রভু, তুমি আমাদের নিঃসংশয়ে বলেছ যে তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে···পৃথিবীর রূপান্তর না হওয়া অবধি।"



শ্রীঅরবিন্দের সমাধি

তাঁর চলে যাবার একটা কারণ আমরা অনুমান করতে পারি, তা হল মা-শ্রীঅরবিন্দের কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঠিক তাই হল, তাঁর তিরোধানের ছ'বছর পরেই অতিমানস আলোর প্রকাশ হল, মা যাকে বলেছেন Supramental Manifestation—তার ফলস্বরূপ আশ্রম বৃহত্তর হতে আরম্ভ করল।

আশ্রম-স্কুল

আশ্রম-স্কুল, যার নাম 'শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র', গড়ে উঠল। দেশ-বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীর এমন ভিড় হতে লাগল যে নূতন ভরতি বন্ধ করে দিতে হল।

একটা কথা মনে রেখো কিন্তু, এই স্কুলের পড়াশোনা, নিয়মকানুন অন্যান্য স্কুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কোন পরীক্ষার বালাই নেই। ডিগ্রি দেওয়া হয় না। কারণ, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে জানা, আত্মজ্ঞান লাভ করা; আর আমাদের সাধারণ শিক্ষায় হয় কেবল অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা। শিক্ষকমণ্ডলী সবাই সাধক-সাধিকা, ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাই-বোন, সকলে এক ভগবতী জননীর সন্তান। তারা একসঙ্গে খায়দায়, বেড়াতে যায়, খেলাধুলা করে। কোন বকাবকি নেই, শাস্তি দেওয়া নেই; ভয়ের সম্বন্ধ নেই। মা বলেন, প্রত্যেক শিক্ষককে যোগী হতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, শিক্ষকের জীবনই হবে ছাত্রছাত্রীদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এখানে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে পাঠ্যবিষয়ে ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অনুকূল হাওয়ায় আমাদের আত্মা জাগে, বাড়ে সৌন্দর্যে, জ্ঞানে, শক্তিতে, আনন্দে। কোন কোন বিষয় ভালো না লাগলে সেগুলি না পড়বার অধিকার ছাত্রদের আছে। তবে শিক্ষকদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে যাতে স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয়।

আশ্রমের উদ্দেশ্য যেমন নূতন জাতি গঠন করা, স্কুলে চলে তেমনি তার শিক্ষা-দীক্ষা। নূতন জাতি গঠনের ভিত্তি গাঁথা হবে এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে। এই স্কুলে যারা শিক্ষা পাবে তারা দেখাবে যে মানুষে মানুষে দেশে দেশে জাতির মধ্যে কোন ভেদ নেই। সব মানবজাতি এক, ভাই ভাই। আজকাল জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, রেষারেষি চলেছে, সৃষ্টি করছে অশান্তি, যুদ্ধ, তা একদিন লোপ পাবে।

অরোভিল

আর একই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠছে অরোভিল (উষানগরী) বা শ্রীঅরবিন্দ নগর, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে। শিক্ষার দিক দিয়ে যে উপাদান তৈরী হচ্ছে, বাস্তবক্ষেত্রে অরোভিলে হবে তার পরীক্ষা ও প্রয়োগ। এই শ্রীঅরবিন্দ নগরে নানা জাতির পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসে পাশাপাশি বাস করবে ভাইয়ের মতন, এক দিব্যজননীর সন্তান হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। কোন হিংসা-দ্বেষ থাকবে না, নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না; থাকবে প্রেম, আনন্দ ও ভগবানের সেবায় উৎসর্গিত জীবন। এরকম চেষ্টা পূর্বে আর কোথাও হয়নি।

অরোভিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মা কি বলেছেন শোন :

"অরোভিল হবে এমন একটি স্থান যেখানে সদিচ্ছাসম্পন্ন, একনিষ্ঠ, অভীপ্সাপরায়ণ সমস্ত মানুষ একত্রে স্বাধীনভাবে জগদ্বাসী হিসাবে বাস করবে।

"অরোভিলে বিরাজ করবে শান্তি, সামঞ্জস্য ; মানুষের যুদ্ধলিপ্সা নিযুক্ত হবে একমাত্র তার দুঃখ, দৈন্য ও কষ্ট জয় করতে, তার অজ্ঞান ও দুর্বলতা অতিক্রম করতে। তার সঙ্কীর্ণতা ও অক্ষমতা জয় করতে......।

অরোভিলে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক, তা প্রতিষ্ঠিত হবে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের ইচ্ছার উপর, দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার উপর নয়।"



অরোভিলের একটি স্কুলবাড়ি (আধুনিক স্থাপত্যের নমুনা)

এই সমস্ত বৃহৎ কাজ ছাড়া আরও অনেক কিছু আশ্রমে বেড়ে চলেছে শ্রীমায়ের দিব্যশক্তির চালনায়। কত লোক যাওয়া-আসা করছে; ক্ষুদ্র মহৎ, সাধারণ অসাধারণ সকলকে জাতিধর্মশ্রেণীনির্বিশেষে শ্রীমা তাঁর আশীর্বাদ, শক্তি, প্রেরণা বিতরণ করছেন। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে শ্রীঅরবিন্দের বাণী, গঠিত হচ্ছে আশ্রম-শাখা ও কেন্দ্র। বিশ ত্রিশ বছর আগে বিদ্বান সমাজে যদিও বা শ্রীঅরবিন্দের নাম উচ্চারিত হত, মায়ের নাম আবদ্ধ ছিল তাঁদের শিষ্যদের মধ্যেই। আর আজ মা সামনে, তাঁর নাম সর্বত্র, কিন্তু তিনি সকলের কাছে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দকে। মা বলেন, শ্রীঅরবিন্দকে প্রকাশ করাই তাঁর কাজ।

অচিরে জগতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে। সকলে গ্রহণ করবে শ্রীঅরবিন্দকে জগদ্‌গুরুরূপে। শ্রীমা দিব্যজননীরূপে আমাদের মাঝে প্রকট হবেন। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও স্বপ্ন সফল হবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে কত বড় আত্মা নীরবে অন্তরালে নিজের কাজ সমাধা করে তেমনি নীরবে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। মুষ্টিমেয় লোক জানতে পারল। আমরা চিনি তাদের যারা আমাদের চোখের সামনে, কিন্তু যোগী মহাযোগীদের খবর কে রাখে? তাঁরা ভগবানের মতো নীরবে অলক্ষ্যে কাজ করে চলে যান; নাম, যশ, স্বীকৃতির কোন অপেক্ষা রাখেন না।

এই হল পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কাহিনী। বাইরের কতকগুলি ঘটনামাত্র, সমুদ্রের বুকে কয়েকটি ঢেউ। তাঁর প্রকৃত জীবনের বিশালতা ও গভীরতার কিছুমাত্র আভাস পেতে হলে তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে। তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে আছেন। তাঁকে ভক্তি ভরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন, বিপদে আপদে রক্ষা করেন, আমাদের আত্মার উন্নতিকল্পে সাহায্য করেন। আরও বুঝবে, তাঁর শক্তি সারা বিশ্বে কী দ্রুতগতিতে প্রবলভাবে কাজ করে চলেছে। এই জন্যে মা বলেছেন, "শ্রীঅরবিন্দ কতকগুলি মতবাদের বা কোন তত্ত্বের প্রচারক বা প্রকাশক নন। তিনি হলেন পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ সক্রিয় শক্তি।"

তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছ। শ্রীমায়ের কথায়, এই রকম যুগ আসে লক্ষ লক্ষ বছর পরে। কবির ভাষায় বলা যায়—

দিন আগত ঐ।

পরিশিষ্ট

১৯৭৩ সালে ১৭ই নভেম্বর মা দেহ রক্ষা করলেন, তখন তাঁর বয়স পঁচানব্বই। আমরা আশা করেছিলাম যে অন্ততপক্ষে একশ' বছর তাঁর পরমায়ু হবে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মায়ের অনেক সন্তান-সন্ততি সাময়িকভাবে মুহ্যমান হয়েছিল। কিন্তু তারা পরিষ্কার অনুভব করছে যে মা সূক্ষ্মশরীরে তাদের সঙ্গে বিরাজ করছেন। দেশে বিদেশে অনেকে স্বপ্নে এমনকি জাগ্রত অবস্থায়ও মায়ের দর্শন পায়, তাঁর উপস্থিতির স্পর্শ পায়, তাঁর বাণী শোনে এবং কাজে নির্দেশ পায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মা নূতন শরীর নিয়ে আবার ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাজ সুন্দর সুশৃঙ্খলায় এগিয়ে চলেছে, বলা যায় তিনিই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর মা বলেছিলেন, "কিছুই বদলায়নি। শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যেক কথা সত্য। সময়ে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে।" মায়ের বেলায়ও তাঁর সন্তানবৃন্দ তাঁরই উক্তি মন্ত্রের মতো অবিরত জপ করে চলেছে।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

নীরদবরণ শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য, সেবক ও 'সাবিত্রী' কাব্যের অনুলেখক। বিলেত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের উপাধি লাভ করে বছরতিনেক পরে পণ্ডিচেরীতে আসেন এবং শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাই তাঁকে কবিতা ও সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। যে কয়েকটি বই তিনি লিখেছেন সেগুলি সবই শ্রীঅরবিন্দানুসারী। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হল :



কবিতা :

Sun-blossoms ● স্বপ্নদীপ ● দেখা দাও
Fifty Poems

সাহিত্য :

Correspondence with Sri Aurobindo Vols. I & II
Talks with Sri Aurobindo Vols. I, II & III
I am here, I am here
Twelve Years with Sri Aurobindo

অনুবাদ :

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা (প্রথম খণ্ড)
এই যে আমি এখানে

পনের টাকা

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০০০৬